ব্যয়কুণ্ঠ সাবধানী কালাতিপাতে গৌরব কি? এ সবেরই এই বলে সমর্থন করা যেতে পারে যে, জীবনের একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার ট্রাজিডিকে মানুষ এড়াতে গিয়ে তাকে এই ভাবেই চাঞ্চল্যের ও নিত্য নূতন গতির মধ্য দিয়েই অমৃতে রূপান্তরিত করতে বাধ্য ;—কেননা তাইতেই যে মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্ব !

কিন্তু সত্যই কি তাই? জোর ক'রে কোনো কথা বলা বড় কঠিন, মানি ; কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপের নবীনতার ও প্রাণচঞ্চলতার সবকিছুরই সমর্থন করা কি একটু কঠিন হ'য়ে পড়ে না—অন্তত আমাদের কাছে? আজকালকার বড় বড় কাফে ও নাচঘরে কর্ণবধিরকর নতুন আমেরিকান নাচের বাদ্যে, স্যাক্সোফোনের আর্ত্তনাদে ও চাল্‌ষ্টনের কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর দৃশ্যে য়ুরোপীয় অনেকেও আজকাল শিহরিত হন—কিন্তু আমেরিকা ত আজকাল য়ুরোপকেও বৃদ্ধ জাতি ব'লে উড়িয়ে দিয়ে স্যাক্সোফোনকেই ভবিষ্যৎ যুগের অনুপম নৃত্যসঙ্গীত ব'লে প্রচার করছে। তাই সন্দেহ হয় যে, নবীনের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে হ'লে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পকলাকেও আজ পাণ্ডুর হ'য়ে যেতে হয় কি না?

তাছাড়া কি ধরণের গল্পালাপে এদের সময় কাটে ও কি রকম বাজে কথাবার্ত্তা ও অর্থহীন রসিকতায় এরা আনন্দ পায় ভাব্‌লে আক্ষেপ হয়ই। জানি সরস কথাবার্ত্তা বলার বা চিন্তাশীল আলোচনা করার ক্ষমতার বীজ আজকের সভ্যতার সমাপ্তিহীন কর্ম্মযজ্ঞের আওতায় অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে অঙ্কুরেই নষ্ট হ'তে বাধ্য কিন্তু তবু... না, আগে আমাদের বান্ধবের দলের গল্পের একটা নমুনা দেই। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিতা। কেননা, তা না হলে বোঝাতে পারব না কেন আজকের য়ুরোপের প্রাণশক্তির এ অমিতব্যয়কে আমাদের একটু অপব্যয় মনে হয়। যদিও এ কথা বলার আর একটা মস্ত বিপদ এই যে, ভয় হয় পাছে এতে ক'রে আমাদের দেশের জড়তার ও তমের সমর্থন করা হ'য়ে পড়ে।

বিপুলকায়া, ইতালিয়ানা ও পোলিয়ানা আমাকে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ওখানকার একটি বিখ্যাত কাফেতে। কাফেটি নাকি আগে ফরাসী শিল্পীদের একটা আড্ডা ছিল। এখনও সেখানে অনেক চিত্রকর গিয়ে থাকেন। উদাহরণ ত আমি কাল আমার বিরাট পাগড়ী ও ভারতীয় বেশে সেখানে গিয়ে বসতেই তিনজন চিত্রকর হুহু শব্দে আমার উদ্ভট বেশের ছবি এঁকে নিলেন ও একজন তাঁর আঁকা ছবিটি আমাকে উপহার দিলেন! এঁরা রাত একটা দুটো অবধি এই ভাবেই সে কাফেটিতে নানান্ সুধীজনের ছবি এঁকে কাটিয়ে থাকেন। চিত্রবিদ্যার এ একটা নতুন চর্চ্চা! ..

বিরাট কোলাহল মুখরিত কাফেটিতে যখন অতিকষ্টে তাঁদের খুঁজে বার করলাম তখন দেখি তাঁরা খুব স্যাণ্ডউইচ, চীজ ও বিয়ারের সদ্ব্যবহার করছেন। আমার চেক্-বন্ধু ও তাঁর ফরাসী-স্ত্রী এসেও হাজির।

বিপুলকায়া অট্টরবে তাঁদের বল্‌লেন যে, তিনি সারাদিন এতই হৈ হৈ-য়ে ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁদের খাওয়া পর্য্যন্ত হয় নি! ব্যস্ততার কারণ—ভার্সেল্‌সের বাগান প্রভৃতি পর্য্যটন! কি বিপুল ব্যস্ততা, ও তার কি যুক্তিসঙ্গত কারণনির্দ্দেশ!

তখন কাফেটির উপর তলায় বিপর্য্যয় ভিড় ও নাচের হর্‌রা চ'লেছে ও নীচের তলায় তিল ধারণের স্থান নেই। অথচ লোক সমাগমের বিরতি নেই সেই রাত বারটা অবধি।

বিপুলকায়া আমার ফরাসী বান্ধবীকে বলেছিলেন যে, পারিসের এ-দিক্‌টার সঙ্গেও আমার পরিচয় করা উচিত। কথাটা সত্য। এ একটা দিক্ বটে! তবে ফলি বার্জের, মুল্যাঁ রুজ, কাসিনো দ পারি—সবই এই দিকের পারিস-জীবনেরই একটা নিদর্শন ; কাজেই ও-দিক্‌টার সঙ্গে আমার পরিচয় যে একেবারে ছিল না তার এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, যখন আমাকে তাঁদের নৈশ হর্‌রায় যোগদান করতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। তাঁদের বিবিধ আহারীয়

ও পানীয়ের সদ্ব্যবহার করা শেষ হ'লে আমরা ছয়জন গেলাম অন্য একটা কাফেতে, যেখানে একটু সুস্থির হ'য়ে ব'সে কথাবার্ত্তা কওয়া যেতে পারে। (এঁদেরও সুস্থির হ'য়ে কথা বল্‌তে ইচ্ছে হয় সময়ে সময়ে তাহ'লে! বিপুল কায়ার সদা ব্যস্ততা না দেখলে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সম্যক বুঝতে পারবেন না কেন আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হ'য়েছিল যে, সুস্থির হ'য়ে কথাবার্ত্তা কওয়ায় তিনি বিশ্বাস করেন।) যাইহোক অপর কাফেটিতে গিয়ে তাঁরা প্রত্যেকে ডজন খানেকে শুক্তি (oyster) খেলেন। তাঁরা বড়ই ব্যথিত হ'লেন যে, আমি শুক্তি খেতে কোনো মতেই রাজি হ'লাম না। কারণ জীবন্ত জীব খাওয়া একটু কঠিন।

জগদীশ বসুর আবিষ্কারের পর তাঁদের জীবন্ত শুক্তি ভক্ষণ সহজতর হ'য়ে গেছে। কারণ, (বিপুলকায়া তর্ক ক'রে আমায় বোঝালেন,) উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। তবে কেন লেবুর রস দিয়ে জীবন্ত শুক্তিকে গলাধঃকরণে আমার এত বিতৃষ্ণা?

বিপুলকায়া হঠাৎ বললেন, 'মানুষের মনের গতি কি পরিবর্ত্তনশীল! আজই বিকেলে আমি একজন গায়কের গান শুনে অশ্রুপাত ক'রেছি;' (এ কথা স্বীকার করতে তিনি গভীর লজ্জা বোধ করলেন)—'অথচ এখন পনরটি জীবন্ত প্রাণীকে দন্তযোগে নিষ্পিষ্ট করে আত্মসেবা করলাম!'

ইতালিয়ানা বল্‌লেন, 'শুক্তি খেতে যে ভারি ভাল। করা যায় কি!'

পোলিয়ানা বল্‌লেন, 'বিপুলকায়া! করছ কি! আবার ছ'টা খাবে?—এই বারটা সদ্ব্যবহারের পর?'

ফরাসিনী আমাকে বল্‌লেন, 'শুক্তি খেতে তোমার এত কুসংস্কার কেন?'

আমার দর্প চূর্ণ হল। বাস্তবিক এমন একটা লজ্জাকর কুসংস্কারও আমার আছে যে, জীবন্ত প্রাণী খেতে কুণ্ঠা বোধ করি!

কিন্তু হায়! কুসংস্কার কি একেবারে যেতে পারে কখনো!

মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে শুনেছিলাম সেই পণ্ডিত মহাশয়ের গল্প যিনি গর্ব্ব ক'রে বলতেন যে, তাঁর কোনও রকম কুসংস্কার নেই।

ছেলেরা তাকে ধরে বসল তাঁকে মদ খেতেই হবে তাহলে।

অগত্যা! পণ্ডিত মহাশয় এক ঢোঁক খেলেন। 'আর এক ঢোঁক পণ্ডিত মহাশয়—বিশেষত আপনার যখন কুসংস্কার নেই।' পণ্ডিত মহাশয় কি করেন?—আর এক ঢোঁক খেলেন। 'আর এক ঢোঁক পণ্ডিত মহাশয়—আপত্তি কি বলুন? কুসংস্কার ত আপনার নেই!'

পণ্ডিত মহাশয় শেষটায় অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে বল্‌লেন, 'বাপু হে, মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে কুসংস্কার নেই বলে কি মাতাল হওয়ার বিরুদ্ধেও কুসংস্কার থাকবে না!'

নিষিদ্ধ মাংসাহারে কুসংস্কার না থাকতে পারে—কিন্তু জীবন্ত জীব! তবু এঁরা বলেন যে, এটাও কুসংস্কার! অগত্যা! ...

পারিস
২৪-৪-২৭.

চতুর্থ খণ্ড

রমঁ্যা রলঁা

অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মিন্‌নার চিঠিখানির উত্তর দিয়া অবধি ক্রিস্‌তফ্ প্রতীক্ষা করিতেছে, কবে জবাব আসে। কিন্তু মিন্‌নার কোন সাড়া শব্দ নাই। ক্রিস্‌তফ্ অধৈর্য্য হয়, বিরক্তি চাপিতে পারে না, অথচ না ভাবিয়াও উপায় নাই। মিন্‌না—এই নামের মোহ তাহাকে এমনি পাইয়া বসিয়াছে যে, সে লেসিং-এর একখণ্ড বই সর্ব্বদা পকেটে করিয়া ঘোরে, ঐ নামটি উহার মধ্যে আছে বলিয়া।

আবার নিজের উপর রাগ হয়। মিন্‌না তাহাকে কত কাজ করিতে বলিয়াছে, তাহার কি উচিত এম্‌নি করিয়া আলস্যে দিন কাটানো? না, সে একটা মস্ত জিনিষ রচনা করিবে। এবং সেইটিকেই যে শুধু মিন্‌নাকে উৎসর্গ করিবে তাহা নয়, তাহার প্রিয়তমার স্মৃতিতে সমস্ত রচনাটিই পবিত্র করিয়া তুলিবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। ক্রিস্‌তফ্ সঙ্গীত রচনায় লাগিয়া গেল। সে যে সুরেই ভাবে। সঙ্গীত যে তার জন্মগত সংস্কার। এক সপ্তাহ সে বাহির হইল না, ঘরের ভিতরে দিনরাত কেবলই সুরের জাল বোনা। মাকেও তখন ঘরে ঢুকিতে দিত না, শুধু একবার তাহার খাবার রাখিয়া যাইবার হুকুম দিত। এই প্রচণ্ড সুরের তোড় যেন কোন্ একটা গহ্বরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, হঠাৎ বিরহ-বেদনার আঘাতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুরনির্ঝর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল। এমন সুখে এমন সহজে সে আর জীবনে কখনো কিছু রচনা করে নাই।

একদিকে প্রেমের অদম্য ক্ষুধা কতকটা তৃপ্ত হইতেছে, অন্য দিকে তাহার অসংযত আবেগ শিল্পীর প্রকৃতিগত সামঞ্জস্যের তাগিদে সমস্ত অত্যুক্তি সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে যেন এক অপরূপ অনুপম রাগিণীতে ঝঙ্কৃত করিয়া ছন্দোবদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। শিল্পী ছাড়া এই আনন্দ অনুভব করিবার সৌভাগ্য কাহারো হয় না! এই সৃজনলীলার ভিতর দিয়াই ত' শিল্পী সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ বেদনার দাসত্ব অতিক্রম করিয়া স্বরাট্ হইয়া উঠেন। তখন সুখ এবং দুঃখ ত' তাহার খেলার পুতুল, শিল্পী এখানে সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে একাসনে বসেন। অবশ্য এই মাহেন্দ্রক্ষণ ক্ষণস্থায়ী নহে। বাস্তব জীবনে পুলকবেদনার তরঙ্গ আবার শিল্পের অমরলোক হইতে শিল্পীকে মর্ত্ত্যলোকে টানিয়া ফেলে।

রচনার সময় ক্রিস্‌তফের হুঁসই ছিল না যে, মিন্‌নার সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইয়াছে। সে তখন যে তাহার মধ্যেই

বাঁচিয়া আছে এবং মিনুনাও যে তাহার প্রাণের মধ্যে এক হইয়া গেছে। কিন্তু রচনা শেষ হইবামাত্র সে অনুভব করিল সে শ্রান্ত, সে নিঃসঙ্গ। মনে পড়িয়া গেল পনেরো দিন পূর্ব্বে সে চিঠি লিখিয়াছে, এখনো উত্তর পায় নাই।

শেষে দ্বিতীয়বার চিঠি লিখিতে বসিল। এবার সে মিনুনাকে বিদ্রূপ করিয়া বেশ একটু ধমক দিয়াই চিঠি লিখিল। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, মিনুনা তাহাকে ভুলিতে পারিবে। কুঁড়েমির জন্য—সে চিঠিতে বকিল,—কি এক বিরাট রচনা সে করিয়াছে, তাহার অস্পষ্ট আভাস মাত্র দিয়া মিনুনাকে ঔৎসুক্যে চঞ্চল করিতে গেল, সে যে নতুন টুপিটি কিনিয়াছে তাহার বর্ণনাও বাদ গেল না, প্রিয়তমার অত্যাচার সে কেমন ভাল ছেলের মত সহ্য করিতে পারে তাহা ভাবিয়াই ক্রিস্‌তফ্‌ ভাবে বিভোর হইয়া উঠিল। মিনুনার হুকুম সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছে, সে কোথাও বাহির হয় না, নিমন্ত্রণ আসিলে শরীর খারাপ বলিয়া কাটাইয়া দেয়! এমনি কত স্নিগ্ধ সঙ্কেতে ভরা চিঠিখানি অতি যত্নে সে পাঠাইয়া ভাবিল একমাত্র মিনুনাই এ চিঠির কদর বুঝিবে। 'ভালবাসা', 'প্রেম' এ সব কথার গন্ধও সে চিঠিতে নাই, শুধু বন্ধুত্বের আমেজ—তাহার পক্ষে এমন সংযত হইয়া চিঠি লেখা কত বড় স্বার্থত্যাগ!

চিঠিখানি পাঠাইয়া সে বেশ একটু শান্তি পাইল। তিন দিনে উত্তর আসিবার কথা, এবার মিনুনা উত্তর না দিয়া থাকিবে? তাহার সাধ্য কি? কিন্তু চতুর্থ দিন কাটিয়া গেল, কোন সাড়াশব্দ নাই। আজ সমস্ত কাজে তাহার উৎসাহ চলিয়া গিয়াছে। অধৈর্য্যে সারাক্ষণ তাহার হাত-পা কাঁপিতেছে। ডাকের সময় সে যেন পাগলের মত কিসের প্রতীক্ষা করে। ছোটখাট চিহ্ন দেখিয়া সে চিঠি পাওয়া না-পাওয়া সম্বন্ধে মনে মনে জুয়া খেলিতে বসিয়া গেল। কেমন একটা কুসংস্কার যেন তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া গেল—শেষ ডাক, চিঠি আসিল না। তাহার ভিতরটা যেন গুঁড়া হইয়া গেল। কাল অবধি কি সে বাঁচিয়া থাকিবে?

এমনি আকুল প্রতীক্ষা ও নিষ্ঠুর নৈরাশ্যের দোটানায় পড়িয়া সে যেন অসুস্থ হইয়া পড়িল। ক্রমশ সে তাহার বাবা ভাই, এমন কি ডাকপিয়নটাকে পর্য্যন্ত সন্দেহ করিতে লাগিল। তাহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া চিঠিখানা চাপিয়া রাখিয়াছে।

মিনুনা লিখিবে না—এ কথা স্বপ্নেও সে ভাবিতে পারে না। হঠাৎ মনে পড়িল, যদি না লিখিয়া থাকে, তবে মিনুনা নিশ্চয়ই মৃত্যুশয্যায় রহিয়াছে, অথবা মরিয়া গিয়াছে। ছুটিয়া পাগলের মত তৃতীয় চিঠি ক্রিস্‌তফ্‌ লিখিয়া বসিল। তাহার মধ্যে ভাষার সংযম এবং বানানের বিশুদ্ধতা দুয়েরই দারুণ অভাব হইয়া পড়িল। ডাকের সময় বহিয়া যায়, তাড়াতাড়িতে চিঠিখানাতে কালি থিবড়াইয়া গেল, খামও খানিকটা নোংরা হইল, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? ছুটিয়া গিয়া ডাকবাক্সে সে চিঠিখানি ফেলিয়া দিল। রাত্রে সে মিনুনাকে স্বপ্ন দেখে, রোগশয্যা হইতে সে যেন তাহাকে ডাকিতেছে—ক্রিস্‌তফ্‌, এস। ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া সে পায়ে হাঁটিয়াই যায় আর কি! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল কোথায় যাইবে? তাহার পথ যে জানা নাই।

চতুর্থ দিন সকালে মিনুনার চিঠি আসিল। ছোট চিঠি, তাও মাত্র আধপাতা লেখা, আড়ষ্ট, দূরত্ব তার প্রতি অক্ষরে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে লিখিয়াছে, কেন খামোকা তুমি নির্ব্বোধের মত এত অধীর হয়েছ? আমি বেশ ভাল আছি,—চিঠি লেখার কোন সময় পাই না—আর একটা কথা, ভবিষ্যতে অমন ক্ষেপে গিয়ে আমাকে চিঠি লিখো না—আর চিঠি না লিখ্‌তে পারলেই ভাল ..."

ক্রিস্‌তফের মাথায় কে যেন একটা মুগুর মারিল, তাহার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান যেন লোপ পাইয়াছে। মিনুনাকে সে দোষ দিতে পারিল না, সব দোষ তাহার নিজের। কেন সে অমন নির্ব্বোধ ও অভদ্রের মত চিঠি লিখিয়াছে? নিজের মাথায় হঠাৎ সে ঘুষি মারিয়া বসিল, কিন্তু সকলই বৃথা,—সে মিনুনাকে যতটা ভালবাসে, মিনুনা যে তাহাকে ততটা বাসে না সেটা স্বীকার না করিয়া আর উপায় নাই। কলের মত দিন কাটিয়া যাইতেছে, ক্রিস্‌তফ্‌ যেন কলের

পুতুল। শুধু একটি চিন্তা—মিন্না একদিন ফিরিবে,—সে কবে?

ফিরিবার দিন ঠিক ছিল কিন্তু সেদিন কারো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এম্নি আরো দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। একদিন সে ঘরে ঢুকিতেছে এমন সময় তাহার ঠাকুরদাদার বন্ধু ফিসার-এর সঙ্গে দেখা। কথাপ্রসঙ্গে বৃদ্ধ বলিয়া বসিল যে, মিন্নাদের বাড়ীতে তাহার ডাক পড়িয়াছে। বজ্রাহতের মত ক্রিস্তফ্ খানিকটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে বলিল, 'ওরা ফিরেছে নাকি?'

'খুব ফাজিল হয়েছিস্ ত? ওদের ফেরার খবরটা আমার চেয়ে তোর কি কম জানা আছে? তারা ত পর্শু এসেছে। খাসা দিন ভায়া'— বলিয়া বৃদ্ধ বেশ একটু শয়তানী হাসি হাসিল। ক্রিস্তফ্ আর কিছু কথা বলিল না, পোষাক পরিয়া ছুটিল। সটান মিন্নাদের বাড়ী হাজির, তখন রাত ন'টা বাজিয়াছে। মা ও মেয়ে বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন, ক্রিস্তফ্‌কে দেখিয় কাহাকেও বিস্মিত হইতে দেখা গেল না। শুধু একটু শিষ্টা অভিবাদন। মিন্না কিছু লিখিতেছিল, টেবিলের উপর দিয়া একবার হাত বাড়াইয়া দিল এবং অন্যমনস্ক ভাবে 'কেমন আছ?' বলিয়া আবার চিঠি লিখিতে লাগিল।

ক্রিস্তফ্ তবু কথা বলিতেছিল, মিন্না একবার ভদ্রতা করিয়া ক্ষমা চাহিল, তারপর কথার মধ্যেই হঠাৎ মা'র সঙ্গে আবার খানিক কথা বলিয়া লইল। ক্রিস্তফ্ কত আবেগ ভরা বেদনামাখা বাণী শুনাইতে চায়, কত কষ্ট সে পাইয়াছে, তাহা জানাইতে চায় কিন্তু কে তাহার কথা শুনিবে? যাহা কিছু বলে তাহার মধ্যেই যেন বেসুর বাজিয়া উঠিতে লাগিল। কেমন যেন মনে হইল যেখানে সে আসিয়াছে সেখানে তাহার জন্য কেহ প্রতীক্ষা করিবার নাই।

চিঠিখানা শেষ করিয়া মিন্না একটা সেলাইয়ের কাজ লইয়া একটু দূরে বসিল এবং তাহার ভ্রমণ-কাহিনী শুনাইতে আরম্ভ করিল। নতুন দেশ নতুন মানুষ—মা ও মেয়ে গল্পে বেশ মশ্‌গুল হইয়া উঠিতেছে, অথচ ক্রিস্তফ্ কিছুই বোঝে না। সে যেন এ রাজ্যে এক অপরিচিত ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া হাসিয়া সে কথায় যোগ দিতে গেল, সে খানিক থাকিতে চায়,—'মিন্না একবার তাকাও, একটিবার তেমনি করিয়া চাও,' সমস্ত প্রাণ তাহার এই কথা বলিতেছে, কিন্তু মিন্না একবারও চাহিল না। তার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা দূরত্ব। সে কার সঙ্গে কথা বলিতেছে? তার সঙ্গেই, না মা'র সঙ্গে? সে একা কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিল কিন্তু মিন্নার মা সমানে বসিয়া রহিলেন। তবু কথা বলিবার উৎসাহ ক্রিস্তফের কমে না, মিন্না শুনিবার ভাণ করিতেছে, হঠাৎ ক্রিস্তফ্ দেখিল তার চোখে মুখে ঔদাসীন্য,—মিন্না হাই তুলিতেছে। ক্রিস্তফ্ স্তম্ভিত হইয়া চুপ। ত্রুটি সারিয়া লইয়া মিন্না বলিল, 'মাপ করো' কেমন একটু শ্রান্তি লাগ্‌ছে।' ক্রিস্তফ্ উঠিয়া দাঁড়াইল, যদিও আশা করিয়াছিল তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করা হইবে। এতটুকুও না। তাহাকে যাইতেই হইল। মিন্না বিদায় দিতে দুয়ার পর্য্যন্তও আসিল না। ঘরের মধ্যেই একবার হাত বাড়াইয়া কাজ সারিয়া লইল।

বাড়ী ফিরিয়া ক্রিস্তফ্ আধমরার মত বিছানায় পড়িল—এই কি সেই মিন্না? কি হইয়াছে, কেন এমন হইল? হতভাগ্য ক্রিস্তফ্ এখনো জানে না—জানিলেও এখনও স্বীকার করিবার সাহসও তার নাই যে, মানুষ বদ্‌লায়, মন বদ্‌লায়, নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন প্রতি পলে পৃথিবীর উপরকার এই জীবননাট্যে কত নিষ্ঠুর অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। কত মানুষ আসিল। কত মানুষ গেল, কত প্রাণ একসুরে বাজিয়া উঠিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাগিণীতে তাহাদের পালা গান শেষ করিল। এক অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় প্রাণ—সে কি বস্তু! কোথায় সে? চারিদিকেই ত এই প্রাণের খণ্ডমাত্র, অথবা গোটা কতক খণ্ডের সমষ্টি কেবলই বদল, কেবলই মরণের ভিতর দিয়া চলিয়াছে—নিষ্ঠুর সত্য। এ সত্যকে স্বীকার করিবার শক্তি ক্রিস্তফ্ এখনো অর্জ্জন করে নাই।

পরদিন আবার মিন্নাদের বাড়ীতে সে যাওয়া স্থির করিল। শেষ বোঝা পড়া তাহাকে করিতেই হইবে। ঢুকিয়া মিন্নাকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহার মা'র

সামনে সে পড়িয়া গেল, তিনি বেশ একটু বিদ্রূপ-হাস্যে তাহাকে চমকিত করিয়া বলিলেন, 'ও! তুমি এসেছ? বেশ? তোমার সঙ্গে দু'একটা আমার কথা আছে। একটু দাড়াও। এস, বাগানে বেড়াই, সেখানেই কথা হবে!' ক্রিস্তফ্ অনুভব করিল কিসের একটা অন্ধকার যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। 'এস, এখানে বসা যাক্।' এইখানে, মনে পড়িল, বিদায়ের পূর্ব্বদিন মিনুনা তাহাকে শেষ চুম্বন দিয়াছে। হঠাৎ নতুন সুরে মিনুনার মা আলাপ আরম্ভ করিলেন। 'আশা করি তুমি সব জান। দেখ ক্রিস্তফ্, তোমার কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার আমি কোনদিন প্রত্যাশা করি নি। তোমাকে আমি বিশ্বাস করতুম, তোমাকে ভালছেলে বলে জান্তুম, তুমি যে আমার মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে এমনি ভাবে শোধ দেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তোমার হাতে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলুম। তোমার উচিত ছিল তার দিকে চেয়ে, আমার দিকে চেয়ে এবং তোমার নিজের দিকে চেয়ে সে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত হওয়া।'

চোখ ফাটিয়া ক্রিস্তফের জল আসিল। সে বহু কষ্টে বলিতে চেষ্টা করিল, 'দেখুন—আমি আপনার এ বিশ্বাসের অবমাননা করি নি। আমি কোন অপরাধ করি নি। আমি মিনুনাকে ভালবাসি,- আমি শয়তান নই, আমি ওকে বিবাহ করতে চাই।'

বেশ একটু সদয় অবজ্ঞার সঙ্গে মহিলাটি উত্তর করিলেন, 'যেটা অসম্ভব, সেটা ভেবে লাভ কি? এ সব নিছক ছেলেমানুষী।'

পাগলের মত ক্রিস্তফ্ আসিয়া মহিলার হাতদুটি ধরিয়া বলিল, 'কেন, কেন অসম্ভব?'

আবার সেই অটল কাঠিন্য ভরা সুর—'না, এ একেবারেই অসম্ভব। টাকার কথা নয়, আরো কত কথা ভাব্‌বার আছে। তুমি যে বংশে—'

আর কথা শেষ করিবার প্রয়োজন হইল না। ক্রিস্তফের বুকে যেন একটা শেল বিঁধিল। তার একটা নতুন চোখ খুলিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মহিলাটি এবার একটু বেশী কারুণ্য ঢালিয়া দু একটি কথা বলিতে গেলেন কিন্তু তার তলার চাঁপা বিরাট মিথ্যাটা তখন ক্রিস্তফ্ বুঝিয়াছে। কোন জবাব না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে আসিয়া দোর বন্ধ করিয়া সে যেন পাগলের মত দুঃখে অপমানে সব কিছুকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়। ঘৃণায় সমস্ত পৃথিবী যেন ছাইয়া গিয়াছে। এ অপমানের প্রতিশোধ সে লইবে। যদি না লইতে পারে সে মরিবে। নির্ব্বোধের মত সে একটা অত্যন্ত কড়া চিঠি লিখিল।

'শ্রদ্ধাস্পদাসু,

আপনি বলেছেন যে, আমার কাছে আপনি ঠকেছেন, কেমন ভাবে ঠকেছেন তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তবে এটা বেশ বুঝ্‌ছি যে, আপনাদের সঙ্গে মিশে আমিই বিষম ঠকেছি। আমি ভেবেছিলুম আপনারা আমার বন্ধু; সে কথা আপনারা বার বার বলেছেন, এবং বরাবর বন্ধুত্বের ভাণ করে এসেছেন। নির্ব্বোধ আমি, এই নিষ্ঠুর পরিহাসটা বুঝতে না পেরে আপনাদের ভালবেসে এসেছি। এখন বুঝছি যে, সবটা প্রকাণ্ড মিথ্যা, স্নেহের মোহে ভুলিয়ে আপনারা আমায় শুধু নাচিয়ে এসেছেন। নিশ্চয়ই আপনাদের খুব আনন্দ দিয়েছি। আমি বাজিয়েছি, সঙ্গীত রচনা করেছি, দীনতম ভৃত্যের মত আপনাদের তৃপ্তি দিতে চেষ্টা করে' এসেছি। ভৃত্য! আজ আমি কারো ভৃত্য নই।

আপনি সে দিন নির্দ্দয় ভাবে বুঝিয়েছেন যে, আপনার কন্যাকে ভালবাসায় আমার অধিকার নাই,—সম্পদে আপনার সমান আমি না হতে পারি, কিন্তু মহত্বে আপনাদের কারুর চেয়ে আমি কম নয়। আপনাদের কারো সাধ্য নেই আমার হৃদয় যে দিকে ছুটছে সে দিক থেকে তাকে ফেরান্। আমি count বা উচ্চ পদস্থ তেমন কিছুই নই, কিন্তু তাদের অনেকের চেয়ে আমার আত্মমর্য্যাদা বেশি। মানুষ বড়, ছোট হয় হৃদয়ের বলে। বড়লোক বা বড়লোকের নফর যে-কেউ ব্যবহারে নীচ তাকে ঘৃণা করবার অধিকার কেউ আমার কাড়তে পারবে না।

মহত্ত্বের ভাণ করে যারা, অথচ হৃদয়ে যাদের মহত্ত্বের কণা মাত্র নেই তাদের আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি।

বিদায়, আমাকে আপনারা ভুল বুঝেছেন, আমাকে ঠকিয়েছেন—আপনাদের সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি সেই মানুষ যে একবার ভালবাসলে আমরণ ভালবাসে। আপনার সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মিন্‌নাকে আমি ভালবাস্‌ব, কারণ সে আমার। এখানে কেউ আমাকে বাধা দিতে পারে না।'

চিঠিখানা ডাকবাক্সে ছাড়িবামাত্রই একটা বিষম আতঙ্কে ক্রিস্তফ আকুল হইয়া উঠিল। সে কি করিয়া বসিল? মিন্‌নার সঙ্গে চিরকালের মত বিচ্ছেদ এখন অনিবার্য্য। তবুও সে আশা করিল অনেকবার মিন্‌নার মা যেমন তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, হয় ত এবারও তেমনি করিবেন—কে বলিতে পারে? পাঁচ দিন সে বিষম যন্ত্রণার মধ্যে প্রতীক্ষা করিল,—শেষে জবাব আসিল:—

'শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার চিঠি দেখে জানলুম যে, আমাদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য ঘনিয়ে উঠেছে, সেটাকে আর বেশী দূর টেনে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত হবে না। যে সম্বন্ধটা আপনার এখন যন্ত্রণার কারণ হয়েছে সেটা জোর ক'রে বজায় রাখা ভাল নয়। সুতরাং তার শেষ করে দেওয়াটাই স্বাভাবিক। আশা করি যথাসময়ে আপনার বন্ধুর অভাব হবে না। আপনি যেমন ভাবে আদৃত হতে চান, তারা তেম্‌নি আদর আপনাকে করবে। ভবিষ্যতে আপনি যে উন্নতি করবেন এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি দূর থেকে সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গীত রচনায় আপনার পারদর্শিতা ও সাফল্য দেখে তৃপ্ত হব।

শুভার্থিনী

মিন্‌নার মা

অতি নিষ্ঠুর দুর্ব্বাক্যও ক্রিস্তফ্‌কে ততটা ব্যথিত করিতে পারিত না যেমন এই ভদ্রতামাখা চিঠিখানা করিল। ক্রিস্তফ্ দেখিল, সব শেষ হইয়াছে। আর মিন্‌নার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হইবে না—অসহ্য! তার সমস্ত আত্মসম্মান কোথায় লোপ পাইল। চোরের মত সে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া ক্ষমা চাহিল। সকলই বৃথা, কোন সাড়া আসিল না।

ক্রিস্তফ্ অনুভব করিল জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বহিয়া চলিয়াছে। সে মরিবে, সে খুন করিবে। কত রকম ভীষণ কাণ্ড করিবার কল্পনা তাহার মনে জাগিল। তরুণদের মনে যে এই রকম ভীষণ প্রেরণা আসে তাহা হয় ত অনেকে স্বীকার করেন না কিন্তু এটা সত্য।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা জান্‌লার দিকে বাহিরের পানে তাকাইয়া ক্রিস্তফ্ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সব যন্ত্রণা এক নিমেষেই ত' শেষ করা যায়,—করিবে কি? তার মা সহজেই ধরিয়া ফেলিলেন, বিষম একটা সমস্যার ভিতর ক্রিস্তফ্ হাবুডুবু খাইতেছে, কিন্তু এতদিন মায়ে-ছেলেতে বন্ধুর মত কথাবার্ত্তা নাই যে হঠাৎ সান্ত্বনা দিতেও সাহস হয় না। শুধু দূর হইতে মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বেড়ান, নির্ব্বাক সমবেদনায় তাঁহার মুখখানি আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। ক্রিস্তফ্ হঠাৎ অনুভব করে—সব হারাইলেও কিছু বাকী থাকে। সে মাকে যথেষ্ট ভালবাসে, অথচ সেই ভালবাসা তাহাকে এ সঙ্কটে কোন সান্ত্বনা কোন নির্ভর দিতে পারিতেছে না। প্রথম যৌবনের আবেগ প্রতিহত হইয়া যখন মানুষকে উন্মাদ করিয়া তোলে তখন প্রতিদিনকার ছোটখাট অথচ চিরন্তন স্নেহ-প্রেম চোখেই পড়ে না।

এমনি অবস্থায় গভীর রাত্রে ক্রিস্তফ্ আচ্ছন্নের মত বসিয়া আছে, বাড়ীর সকলে শান্ত নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময় সিঁড়িতে চাপা পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল, চাপা গলায় যেন কাহারা কথা বলিতেছে, হঠাৎ মনে পড়িল বাবা ত' এখনো ফেরেন নাই, নিশ্চয়ই তাঁহার বন্ধুরা মাতাল অবস্থায় তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া যাইতেছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহাকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। দিন দিন তাঁহার চরম অধোগতি হইতেছে। মা যেন হঠাৎ ছুটিয়া গেলেন, কেমন একটা আতঙ্কে ক্রিস্তফ্ শিহরিয়া উঠিল, ছুটিয়া

দরজার কাছে আসিয়াই সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, জনকতক লোক অস্পষ্ট আলোকে তাহার পিতার মৃতদেহ বহিয়া আনিতেছে। টপ্ টপ্ করিয়া পোষাক হইতে জল পড়িতেছে, লুইসা পাশে দাঁড়াইয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে বুঝি। মেল্‌শিয়ো নিকটে নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছে।

চক্ষের নিমেষে ক্রিস্তফের যত ব্যক্তিগত দুঃখ শোক অভিমান অপমান কোথায় ভাসিয়া গেল। মাকে ধরিয়া পিতার মৃতদেহের পার্শ্বে সে বসিল। মেল্‌শিয়োর শেষ নিদ্রায় আচ্ছন্ন, মুখখানি দেখিতে দেখিতে ক্রিস্তফ্ অনুভব করিল, ছেলে বয়সের যত ছেলেমানুষি সব যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। মিন্না, তার ভালবাসা, আহত আত্মসম্মান—তুচ্ছ, কত তুচ্ছ! এই ভীষণ মৃত্যুর শাসনে! এত কষ্ট এত দুঃখ জীবনে পাইয়া মানুষ কি শেষ পুরস্কার এমনি ভাবেই লাভ করে? গভীর সমবেদনায় তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল, পিতার যত দোষ ত্রুটি সে যেন সব ভুলিয়া গিয়াছে। শুধু মনে পড়িতেছে তাঁর দু'একটি স্নেহের কথা, দু'একটি আদর,—সেইগুলিই আজ তাহার কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতে তার বুক ফাটিয়া গেল, তার দুর্ব্বল পিতা লজ্জায় বলিয়া উঠিয়াছিল,—'ক্রিস্তফ, আমায় ঘৃণা করিস নি।' ব্যর্থ জীবনের এই ভীষণ অনুশোচনার মর্ম্মভেদী সুর তার কানে এখনও বাজিতেছে। উঃ এমনি করিয়া জীবন শেষ করা! তাহা অপেক্ষা সহস্র আঘাত লক্ষ বেদনা আসুক। এই কিছু পূর্ব্বেই না সে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিল। নির্ব্বোধ! ক্রিস্তফ্ চকিতে বুঝিল, জীবন এক অন্তহীন সংগ্রাম, এখানে সন্ধি নাই, যে কেহ জয়ী হইতে চায়, মানুষ হইতে চায় তাহাকে অসংখ্য অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিতে হইবে; প্রকৃতির অন্ধ গতির অসংযত ক্ষুধা তৃষ্ণা কত ভীষণ চিন্তা কল্পনা, প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রাণকে অবনতি ও ধ্বংসের গহ্বরে টানিতে চেষ্টা করিতেছে। সে বুঝিল যে, এই গহ্বরের মধ্যে সে প্রায় পড়িয়াছিল। সুখ প্রেম—সে ত' ক্ষণিকের সঙ্গী, আত্মার যোদ্ধবেশ অপসৃত করিয়া আরাম করিবার লোভ দেখায় মাত্র, কিন্তু বর্ম্ম খুলিবার যুদ্ধ থামাইবার পরিণাম কি? সে ত সিংহাসন ছাড়িয়া নীচে পড়িয়া গেল,—না, আমি পড়িব না! পনেরো বছরের যুবা ক্রিস্তফ, তার সন্ধানের ভিতর দিয়া যেন ঈশ্বরের অমোঘ গম্ভীর কণ্ঠ-ধ্বনি শুনিল।—'এগিয়ে চল্, এগিয়ে—চল্। বিশ্রাম করতে চাস্ নে।' 'কিন্তু প্রভু, কোথায় যাব? যেখানেই যাই—যা কিছু করি, সবেরই কি এক পরিণতি নয়? সব কি ঐখানে শেষ হচ্ছে না?' হাঁ, মৃত্যু অবধি মৃত্যুর অন্তরস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করে যেতে হবে। সহ্য করা চাই, সুখী হবার জন্য বাঁচা নয়, আমার নিয়ম পরিপূর্ণ করবার জন্যই বাঁচা। দুঃখ বেদনায় জলে পুড়ে' যাওয়া—মরা, এ সব ত' আছেই, কিন্তু একটি জিনিষ ভুলনে চলবে না,—মানুষ হতে হবে।"

—ক্রমশ

কৈশোর সমাপ্ত

বৈদেশী বন্ধু

জসীম উদ্‌দীন

(ঘাটুগানের সুর—ময়মনসীংহের ভাষা)

রইও আমার সাথে রে বন্ধে
রইও আমার সাথে
সীন্তার সিন্দুর কইরা
পরবাম তোমায় মাথে।
(রে পরান বন্ধু)

ও বন্ধে রে,—
ধানের আগে শীষ রে বন্ধু মাথায় শিশির জ্বলে
তার থইনে তোমার শোভা আমার চোখের জলে।
(রে পরান বন্ধু)

ও বন্ধে রে,—
তোমার গলায় ফুল রে বন্ধু আমার কাটার ঘা
বুকের বসন বিছায়ে দিবাম যেথায় ফেল্‌বান পা।
(রে পরান বন্ধু)

ও বন্ধে রে,—
আমার কাল আউখেরে তোমার, ভাসে সোনার মুখ
কাল মেঘে বিজলী জাল্যা বাড়াও দেয়ার দুখ।
(রে পরান বন্ধু)

ও বন্ধে রে,—
তুমি ত অজান বন্ধে মুই ভিন নাগরী
গাঙের পানিত্ ভাসে যেমন শিশুচাঁদের তরী।
(রে পরাণ বন্ধু)

ও বন্ধেরে,—

রোদে যদি যাইবান রে বন্ধে পাইবান যদি দুখ
দৈঘল ক্যাশ ছাপায়া ঢাকবাম তোমার চান্দ মুখ।
(রে পরান বন্ধু)

পরবাম=পরিব, থইনে=হইতে, দিবাম=দিব, ফেলবান=ফেলবে, আউখে=চোখে, মুই=আমি, পানিত=জলে, যাইবান=যাও, পাইবান=পাও, দৈঘল-ক্যাশ=লম্বা চুল, ঢাকবাম=ঢাকিব।

অপরাধিনী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অন্ধকার ঘরে বসিয়া মণীষা বাহিরের মুক্ত আকাশের পানে চাহিয়াছিল।

আকাশের পশ্চিমদিক বাহিয়া একখানা কালো মেঘ উঠিতেছিল পূর্ণিমার চাঁদটিকে ঢাকিয়া দিবার জন্য। কোথায় বসিয়া একটা পাখী ডাকিতেছিল—চোখ গেল, চোখ গেল। চাঁদের অম্লান কিরণ ধারা পৃথিবীর বুকে, ছড়াইয়া পড়িয়া অসুন্দরকেও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

বাহিরের আলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে পৌছাইতে পারে নাই, ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মুক্ত আকাশ, মুক্ত চাঁদের আলো পৃথিবী মুক্ত ভাবে ভোগ করিয়া যাইতেছে। পাপিয়া মুক্ত কণ্ঠে গান গাহিতেছে, কেহই মণীষার মত পরাধীন নয়।

আজ সম্মুখের মুক্ত আলোর পানে তাকাইয়া মণীষা কিছুতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস রোধ করিতে পারিল না। একবার সে পিছন ফিরিয়া ভিতর পানে চাহিল—অন্ধকার, নিবিড় নিকষ কালো অন্ধকার। আলো কই,—আলো কই?

আবার সে সম্মুখের পানে চাহিল, অমল ধবল জ্যোৎস্নায় দিক উদ্ভাসিত। কালো মেঘখানা অনেকখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, মিনিট পাঁচের মধ্যে চাঁদ ঢাকিয়া ফেলিবে, পৃথিবীর বুকে কালোর ঢল নামিয়া আসিবে।

আজ মনে পড়িতেছিল তাহার জীবনের অতীত কালের কাহিনী।

সে আজ কত কালের কথা,—কতদিনের কথা! না, বড় বেশী কাল তো নয়; মাঝে চৌদ্দটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে সে ছিল কোথায়, আজ ধাপে ধাপে নামিতে নামিতে আসিয়া পড়িয়াছে কোথায়? জীবনের প্রথম অধ্যায়ের যখন সূচনা হইয়াছিল তখন কে জানিয়াছিল যে জীবনের সেই আলোর সূচনা এমনই নিবিড় অন্ধকারে ছাইয়া যাইবে!

মনে পড়ে সেই ঘরখানির কথা—আনন্দে ভরা, শান্তি-ময় আড্ডা। সংসারে মা ভাই বোন। আজ ছোট ছোট

ভাই-বোনগুলির কথা মনে পড়ে, দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়িয়া বুকটা ফাটিয়া যায়।

ক্ষিতু তখন এক বৎসরের শিশু মাত্র, তখনই সে দিদা বলিতে শিখিয়াছিল, কেহ দিদাকে ডাকিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে থামিয়া গিয়া ব্যগ্র চোখে চারিদিক পানে চাহিত।

তৃপ্তি সাত বৎসরের বালিকা, দিদির বুকের মধ্যে মুখটা রাখিয়া সে ঘুমাইত, তাহার পুতুল দিদিকে সাজাইয়া দিতে হইত। মনীশ ও দানীশ দুটি ভাই স্কুলে যাইত, তাহাদের বই খাতা পেনসিল দিদি গুছাইয়া রাখিত, তাহাদের জন্য সকালবেলা তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধিয়া দিত। সংসারে সে যেন এই কয়টি ভাই-বোনের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছিল।

মাত্র এগার বৎসর বয়সের প্রারম্ভে কোন একদিন সে দেবের পূজায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল তাহা তাহার মনে নাই। মনে পড়ে আজ—স্বপ্নের মত দেখা স্বামীর সেই চন্দন চর্চিত মুখখানা। এগার বৎসরের বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া ছোট ভাই-বোন কয়টিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া চোখের জলে ভাসিয়া জোর করিয়া বলিয়াছিল সে আর কখনও শ্বশুরালয়ে যাইবে না, —কিছুতেই না। সে দিনে কচি ভাই-বোনদের ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে একেবারেই দুঃসহ ছিল।

তাহার পর হঠাৎ একদিন যখন শুনিতে পাইল তাহার তরুণ স্বামী মারা গিয়াছে এবং মা চীৎকার করিয়া মাটিতে আছড়াইয়া পড়িলেন তখন প্রথমটায় সে কেমন স্তম্ভিত হইয়া গেলে, তাহার পর তাহার যখন মনে হইল আর তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে না তখন সে ছোট ভাই-বোনেদের লইয়া মহোল্লাসে খেলায় মাতিল।

সে সিন্দুর মুছিল, হাতের শাঁখা লোহা নির্ব্বিবাদে খুলিয়া ফেলিল; মা প্রাণ ধরিয়া তাহাকে থান ধরাইতে পারিলেন না। তাহার অলঙ্কারাদি পূর্ব্ববৎ গাত্রে রহিল, রহিল না শুধু আমিষ আহার।

ইহাতে মণীষা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই আনন্দই পাইয়াছিল এবং তাহার বিধবা হওয়ার বিবরণ, তাহার ত্যাগ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া ফিরিয়াছিল; তাহার সখী অমিয়া মুখ বক্র করিয়া বলিয়াছিল, 'মরণ আর কি, বিধবা হয়ে আর মুখ দেখাতে লজ্জা করছে না! এখনও শাড়ী গয়না পরছিস কোন্ মুখে লা, গলায় দড়ি, গলায় দড়ি।'

বিস্ময়ে সে তখন দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার পানে তাকাইয়াছিল, প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই অমিয়া কেন এ কথা বলিল। বুঝিতে পারিল পরে একদিন। আপনাকে ধিক্কার দিয়া সে অলঙ্কার শাড়ী খুলিয়া ফেলিয়া থান পরিল এবং সকল বিষয়ে নিজেকে সংযত রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল।

ইহার পর হইতে সে আর কোথাও বেড়াইতে যাইত না; হাসি ও আনন্দের সংস্রব এড়াইয়া চলিল। ঘাটে পথে গেলে পাছে কাহারও সহিত দেখা হয় এই ভয়ে সে প্রত্যূষে—দ্বিপ্রহরে অথবা সন্ধ্যার পরে বাহিরের কাজ করিয়া লইত।

মা কাঁদিতেন, সে শক্ত হইয়া থাকিত। সে যে বিধবা, সে যে সংসারে সকলের মাঝে বাস করিয়াও সংসারের সব হইতে নির্ব্বাসিতা এই বেদনাটাই তাহাকে অহরহ দারুণ বেদনা দিত।

সেই দিন তাহার মনে হইয়াছিল, তাহার বাল্যসখী তারার বিবাহে কোন মাঙ্গলিক কাজে তাহাকে হাত দিতে দেওয়া হয় নাই। মা তাহাকে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, সে যেন বিবাহ বাড়ীর কোন কাজে হাত না দেয়, কিন্তু মায়ের সে নিষেধ উপেক্ষা করিয়া সে বিবাহ বাড়ীতে গিয়াছিল এবং বরণডালা ঘর হইতে উঠানে আনিবার জন্য বাড়ীর গৃহিণী যখন সকলকে ডাকাডাকি করিতেছিলেন অথচ কাজের সময়ে কাহাকেও পাওয়া যাইতেছিল না, তখন এই অলক্ষণা মেয়েটি বরণডালা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া দিল! ইহার পরের ঘটনা বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন, শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে—সে দিন মণীষার কাঁদিয়া কাটিয়াছিল এবং এই আঘাতেই সে সচেতন হইয়াছিল।

সে অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছিল, সে বিশ্বের ত্যক্ত, সকলে তাহাকে কতখানি তফাতে রাখিয়া চলে। নীরবে সংসারের কাজ সে করিয়া যাইত,—শত কষ্ট হইলেও মুখে তাহা কখনও প্রকাশ করিত না।

তথাপি বেশ দিন যাইতেছিল।

তাহার অদৃষ্টাকাশে ধূমকেতু উঠিতেছিল, তাহার ভবিষ্যৎ শেষ কালে এই অধঃপতন বহিয়া আনিল।

সে ছিল ধনীর সন্তান, আদরের দুলাল। নীরেন তখন প্রেসিডেন্সীতে পড়িত, পিতার অর্থ অবাধে উড়াইত।

এই ছেলেটির দৃষ্টিপথ হইতে তরুণী নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারিল না। সে যখন প্রেমের কাহিনী মৃদুগুঞ্জনে তাহার কানে ঢালিয়া দিতে লাগিল তখন তরুণী মুখ ফিরাইতে পারিল না, বিস্ময়ে তাহার সুন্দর মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল।

সে মা ছাড়া বাহিরের আর কাহারও কাছে এত আদর পায় নাই, তাহার বুভুক্ষু অন্তরখানা তাই সহজেই আকৃষ্ট হইল, সে ধরা দিল। তখন নীরেন ছিল তাহার কাছে দেবতা—দেবতার আহ্বানে সে সাড়া দিল।

তাহার জ্ঞান ফিরিল সেই দিন যেদিন সে দেখিল দেবতার মোহে মুগ্ধ হইয়া সে একেবারে ট্রেনে উঠিয়া পড়িয়াছে, রজনীর বুক চিরিয়া ট্রেন হুস হুস করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দেবতার পায়ের কাছে সে আছড়াইয়া পড়িল, "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছো, আমায় বাড়ী দিয়ে এসো।"

নীরেন একটু হাসিয়া তাহাকে শুধু কোলের দিকে টানিয়া লইল।

ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা সেই পুরাতন কথা। বাসনা যখন মিটিয়া গেল—তখন পুরুষ জীর্ণ বস্ত্রের মতই তাহাকে ফেলিয়া দিল। একদিন নীরেন আসিল না, এমনি করিয়া কত দিন আসিল কত দিন গেল, সে আর ফিরিল না।

একদিন যে দিনকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে সেই-দিনের পানে মনীষা ফিরিয়া তাকাইল। উঃ, তাহার সামনে পিছনে চারিদিকে নিবিড় কালায় ঢাকা, সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

হায় রে, ঘরে যাইতে চায় সে, কিন্তু কোন্ পথে সে যাইবে, কেমন করিয়া যাইবে!

গেলে মা ভাই বোন তাহাকে গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা সে ভাবিল না, অতদূর ভাবিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না, সে শুধু ভাবিতে লাগিল কেমন করিয়া যাওয়া যায়।

সঙ্কল্প কাজে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না, এক-দিন দ্বিপ্রহরে অভুক্ত অস্নাত সত্যই সে নিজেদের ঘরের ছায়ায় উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিদ্যুৎবেগে তাহার ফেরার খবর কখন ছড়াইয়া পড়িল, লোকজনে বাড়ীটা ভরিয়া গেল। সকলের চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি; কুলত্যাগিনী বিধবা আবার ফিরিয়া আসিল কোন্ মুখ লইয়া। ছিঃ ছিঃ!

কন্যার আর্ত্তরোদনে বিধবা মায়ের প্রাণ বিগলিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সমাজের ভয়ে—অন্য সন্তান কয়টির পানে তাকাইয়া তিনি কুলত্যাগিনী কন্যাকে বুকে লইতে পারিলেন না, তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না। তখন যদি অভাগিনী ঘরে স্থান পাইত হয় তো তাহার জীবনের ধারা বদলাইয়া যাইত; সে উন্নত হইত, তাহার জীবনটা এমন মসীময় অন্ধকারে আবৃত হইত না।

গ্রামের বুকে কুলত্যাগিনীর স্থান হইল না, নিজেকে ধিক্কার দিয়া সমাজকে ধিক্কার দিয়া মনীষা চলিয়া গেল।

কোথায় গেল সে?—গেল পাপের স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে। অবশ্য সৎপথ অনেক ছিল কিন্তু প্রবল জ্বালা তাহার বুকে, সে জ্বালা নিভাইতে সে অনন্ত নরকে ঝাঁপ দিল।

পথ কি পিছল, একবার পা দিতে একেবারে নীচে পড়িতে হয়! কি উৎকট নেশা এ, কিছুতেই ইহার ঘোর কাটে না যে!

কিন্তু যতই নামিয়া যাওয়া হোক না কে, অন্তর যতই কঠিন বিবেচনা করা যাক না কেন, এক দিন জ্ঞান সকলেরই ফেরে—এ সত্যকে জানিতেই হইবে। যত বড় মহাপাপীই হোক, একদিন তাহাকে পিছন পানে ফিরি-তেই হইবে।

একদিন এমনই একটা অতর্কিত আঘাতে মনীষার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গাস্নান করিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল, পথের উপর একটি গৈরিকধারী বালক ব্রাহ্মণের দেখা মিলিয়া গেল।

বালকটির পানে একবার তাকাইয়া মণীষা আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। এমন সৌম্য মূর্ত্তি সে খুব কমই দেখিতে পাইয়াছে; দেখিয়া মনে হয় সে সবে মাত্র দণ্ডী ভাসাইয়া আসিয়াছে। মুণ্ডিত মস্তক, দীপ্ত মুখ; বয়স বড় জোড় একাদশ বর্ষ হইবে।

সম্মুখে তাহাকে দেখিয়াই বালক ব্রাহ্মণ হাত পাতিল, 'মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে, আমার কিছু দাও।'

বিগলিত কণ্ঠে মণীষা বলিল, 'আমার কাছে তো কিছু নেই বাবা। ওই আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে, আমার সঙ্গে চল, আজ আমার বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ।

বালকের মা ডাকে তাহার বুকটা জুড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল তাহাকে একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে, কিন্তু সাহসে কুলাইল না।

পথে চলিতে চলিতে মণীষা বালকের অনেক কথা জানিয়া ফেলিল। জগতে তাহার কেহ নাই, আজ এক বৎসর হইল অভাগিনী মাও চলিয়া গিয়াছেন, তাহার পিতা কোন সহৃদয় মহাত্মা দিয়াছেন আজই দণ্ডী ভাসাইয়া সে বাহিরে হইয়া আসিয়াছে। সে এমনি ভাবে এখন বেড়াইবে, ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

বালকের দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে কতবার মণীষার চোখে জল আসিল, কতবার সে মুছিল।

রুদ্ধকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার বাড়ী থাকবে বাবা, আমি তোমায় মায়ের মত ভালবাসব।'

বালক বার কত তাহার পানে তাকাইল। মণীষার গা তখন অলঙ্কারশূন্য, পরণে শুভ্র থান। গঙ্গাস্নানের সময় সে এমনি বেশে যাইত।

ব্রাহ্মণ বালক বলিল, কিন্তু আমি কারও ছোঁওয়া তো খাব না। আপনি বিধবা, কেবল আপনার হাতেই খাব, তা বলে দিচ্ছি।

'তাই হবে বাবা, আমি নিজেই রোজ তোমায় রেঁধে দেব।'

সে কে, কি তাহা নিজেই তখন ভুলিয়া গিয়াছিল, বাড়ী আসিতেই সম্মুখে তাহার তিন চারজন বন্ধু,—

'বাহবা রে, মণিবিবি আজ বিধবার বেশ যে! হুর্ রে, এ সন্নিসী বাবাজীকে জুটালে কোথা থেকে? তা হচ্ছে না বাবা, দীক্ষাটীক্ষা এখন হচ্ছে না—তুমি সরে পড় বাবা আগুনের ফুলকি, আমাদের ঘর জ্বালাতে এসো না বলে দিচ্ছি।'

মণীষা ধমক দিল,—'আঃ, মাতলামো করছ, বাড়ী যাও এখন,—আমার কাজ আছে।'

একজন বিকট স্বরে বলিয়া উঠিল, 'আমাদের পাঠিয়ে তুমি বুঝি মন্ত্র নেবে, সন্ন্যাসিনী হবে? ও সব হচ্ছে না। মণিবিবি, দীক্ষা এখন হচ্ছে না।'

এই সব মাতালের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিয়া মণীষা মুখ ফিরাইয়া দেখিল—বালক দাঁড়াইয়া, তার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছে, সে আর পদ মাত্র অগ্রসর হয় নাই।

মনীষা বলিল,—'এসো, বাবা।'

দৃপ্তকণ্ঠে বালক বলিল, 'মাপ করবেন মা, বড় ক্ষুধার্ত্ত হলেও বেশ্যার অন্ন গ্রহণ করা দূরে থাক, বেশ্যার ঘরেও আমি পা দেব না। কিন্তু কি করেছেন মা, কোথা হতে কোথায় এসেছেন তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? যে ফুল দিয়ে দেবতার পূজা হতো সেই ফুল কোথায় ফেলেছেন? ওই যে সুন্দর মুখ আপনার ওতে যে ভগবানের ছায়া ভেসে উঠত, আপনি এত সুন্দর হয়ে এত কুৎসিত মা, এ তো আমি ধারণা করতে পারি নি। আমায় ক্ষমা করবেন, আমি চল্লুম।'

মুহূর্ত্তে সে কোথায় চলিয়া গেল, মনীষা আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই একটি দিনের একটি ঘটনায় সে যেন অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মনীষার বুকে বড় আঘাত লাগিয়াছিল, সে নিজের জীবনের গতি ফিরাইল।

এবার সে সৎভাবে জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা করিল, বাসা ছাড়িয়া দিয়া জনৈক সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া গেল।

এই সময়টা সে যথার্থই শান্তি পাইয়াছিল, তাহার মনের ক্লেদ কাটিয়া গিয়াছিল, চোখের জলে সে নিজের পাপ ধুইতে পারিয়াছিল।

গুরুকে সে দেবতার মত ভক্তি করিত কিন্তু দেবতা তাহার ভক্তি অটুট রাখিতে পারিলেন না। জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তে যে ভুল করিয়া দেবতা ভ্রমে মানুষকে সঙ্গী করিয়া গৃহের বাহিরে পা দিয়াছিল, জীবনের মধ্যাহ্নে সে আর একটি রক্তমাংস কামনায় গঠিত মানুষকে দেবতা বলিয়া বরণ করিয়া লইল, এবারে সে প্রতারিত হইল। গুরু প্রথম যে দিন তাঁহার পাপ বাসনা মুখে ব্যক্ত করিলেন সেই দিন তাহার অন্তর পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে গুরুর আশ্রম ছাড়িয়া পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, পিশাচাধম গুরু তাহাকে আটক করিলেন।

আত্মরক্ষার মানসে মনীষা উন্মাদিনীর মতই হইয়া উঠিয়াছিল, পাষণ্ড প্রকৃতি গুরু তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, সে উন্মাদিনীর মতই দায়ের কোপ তাহার মাথায় বসাইয়া দিল।

শহরময় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। মনীষা ধৃত হইল, কেন সে নারী এবং শিষ্যা হইয়া গুরু হত্যা করিল এ প্রশ্নের উত্তর সে পুলিশের কাছে দিল না।

ধিক্কারে তাহার অন্তরটা তখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, নিজের নারী-জীবনে তাহার ঘৃণা আসিয়াছিল।

এই পুরুষ—দুনিয়ায় ইহারাই শ্রেষ্ঠ—বরেণ্য—মাননীয়। এই পুরুষ দুস্থা বিধবাকে প্রলোভন দেখাইয়া ঘরের বাহির করে, পথের মাঝে কলঙ্কের মাঝখানে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়ে, আর ফিরিয়াও চায় না। এই পুরুষ—সমাজের কর্ত্তা, ইচ্ছানুসারে দণ্ডদাতা। যে নারীকে গৃহ হইতে নিজেই বাহির করিয়া আনে, আবার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া বিদায় করিয়া দেয় ইহারাই দুর্ব্বল নারী, প্রলোভনে সহজে পড়ে, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না। অথচ এই পুরুষ—ইহারাই উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করে নারী আমাদের মা ভগিনী ও কন্যা।

মনীষা নির্ব্বাক রহিল, একটা প্রশ্নের উত্তরও সে দিল না।

কাল তাহার বিচারের দিন। অবশ্যম্ভাবী দণ্ড মৃত্যু, তাহা সে বেশ জানিতেছিল এবং সে জন্য সে প্রস্তুতও ছিল। এই প্রতারণাময় পৃথিবীতে বাস করিতে আর তাহার আর ইচ্ছা নাই।

বাহিরের চন্দ্রালোকিত প্রকৃতির পানে তাকাইয়া সে ভাবিতেছিল, সে তো মরিবেই তাহা জানে, কিন্তু কি রূপ শোচনীয়ভাবে তাহাকে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে হইবে। সহস্র চোখের সম্মুখ দিয়া সে বধ্যভূমিতে চলিবে কি করিয়া?

আজ সেই চিরপরিচিত ঘরের কথা, সেই দেশের কথা, সেই চিরপরিচিত গ্রামবাসীদের কথা তাহার মনে হইতেছিল।

আর মনে হইতেছিল নির্দ্দয় পুরুষের কথা, যে তাহাকে সেই সুখময় ঘর হইতে পথের মাঝে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে।

মনীষা একবার অন্তরের পানে তাকাইল, সেই দীর্ঘ সুন্দর মূর্ত্তি এখনও, জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, কত লোক আসিল কত লোক চলিয়া গেল, সে মূর্ত্তি মলিন হয় নাই।

আজ মনে হইল জগতে সে প্রথম ও শেষ ভালবাসিয়াছিল তাহাকে—সেই প্রতারককে। দেবতার মত অন্তরের শ্রদ্ধা তাহাকেই সে দিয়াছিল, এখনও সে তাহাকে ভুলে নাই, ভুলিতে পারিবে না।

কণ্ঠে তাহার দোদুল্যমান একটি সরু হার, এই হারের লকেটে একটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি, এ হার সেই প্রতারকের, এই তাহার প্রণয়চিহ্ন। কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, হয় তো কত বড় সে হইয়াছে গতজীবনের কথা আর তাহার মনে নাই। কিন্তু সে,—সে যে এখনও বর্ত্তমান, এখনও সে সেই কথা মনে করে।

বিচারালয়ে সে গিয়া যখন দাঁড়াইল, সে যখন চোখ তুলিয়া জজের পানে তাকাইল তখন তাহার মনে হইল সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতেছে, আদালত লোক জন সব অদৃশ্য হইয়া গেল, কাঁপিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল, আবার চাহিল, ভাল করিয়া দেখিল—হ্যাঁ, এ সেই, এ সেই প্রতারক,

যাহার প্রতিমূর্ত্তি আজও তাহার বুকে, যাহার প্রথম প্রণয়চিহ্ন আজও তাহার গলে।

আজ সে কত উচ্চে, আজ সে সকলের নিকট মাননীয় গণনীয়, আর সে—সে সকলের ঘৃণার পাত্রী, পতিতা একটি নারী। পতিতা যে আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করিয়াছে তাহা কেহ বুঝিবে না।

বিচার আরম্ভ হইল।

মনীষাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল,—'তুমি খুন্ করেছ?' সে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ করেছি।'

'কেন করেছ?'

অকম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, 'আমার সঙ্গে বিবাদ হয়েছিল তাই খুন করেছি।'

তাহার উত্তর শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহাকে যত প্রশ্ন করা হইল সে সবগুলির এমনই উত্তর দিল যে জজ মিঃ ব্যানার্জিও বিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মনীষার বিচার শেষ হইল, শাস্তি প্রাণদণ্ড।

নারীর মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে হাত দু'খানা নিঃশব্দে কপালে ঠেকাইল মাত্র।

অপরাধিনীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল সে কাহাকেও দেখিতে চাহে কি?

সে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল,—জজ সাহেবকে সে একবার দেখিতে চায়।

জেলার প্রথমটা আশ্চর্য্য হইয়া এই পতিতার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর চলিয়া গেলেন।

মিঃ ব্যানার্জি পতিতার আবদার শুনিয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর দেখা করিতে সম্মত হইলেন। তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন এই নারী তাঁহাকে তাহার গোপনীয় কোন কথা বলিতে চায়, নহিলে কেবল মাত্র তাঁহাকেই পাঁচ মিনিটের জন্য তাহার নিকটে চায় কেন?

পরদিন প্রত্যুষে ফাঁসি হইবে। রবিবার বৈকালে মিঃ ব্যানার্জি দেখা করিতে চলিলেন।

বাহিরে তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, প্রহরী বন্দিনী নারীকে সেখানে লইয়া আসিল।

তাহার মলিন মুখখানার দিকে তাকাইয়া মিঃ ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত লোক থাকতে আমার সঙ্গে অন্তত পক্ষে পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা করার প্রয়োজন আমি কিছু বুঝতে পারছি নে, এর কারণ কি?'

মনীষা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'আপনার কাছে আমি গোটা-কত কথা বলতে চাই, কিন্তু আর কেউ সেখানে থাকা আমার ইচ্ছা নয়। আপনি ভয় পাবেন না, প্রথমত আমি নারী, দ্বিতীয়ত আমার হাত শিকলে বাঁধা, আপনার যে অনিষ্ট আমি করতে পারব না এ বিশ্বাস করুন।'

অপ্রতিভ মিঃ ব্যানার্জি প্রহরীকে সরিয়া যাইতে বলিলেন।

মনীষা বদ্ধ হাতখানা দিয়া অতি কষ্টে গলার হারটা খুলিয়া ফেলিল,—'আপনাকে আপনার জিনিষ ফিরিয়ে দিতে চাই জজ-সাহেব। মরণের সময় নিঝঞ্ঝাটে যেতে চাই; আপনার জিনিষ আপনি নিন!'

'আমার জিনিষ?' মিঃ ব্যানার্জির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল;—'কই দেখি।'

হারটা তিনি তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইলেন।

আর্দ্র কণ্ঠে মনীষা বলিল, 'হ্যাঁ, আপনার জিনিষ। মিঃ ব্যানার্জি,—না; তা বলব না, নীরেন বাবু,—মনে পড়ে কি অতীতের সেই একদিনের কথা, একটি তরুণী বিধবার হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসা? কোথায় গেল সে কথা—আমি তোমায় ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ করব? দুদিনের তৃষা মিটে যেতে দুর্ভাগিনী নারীকে কোথায় ফেলে এলে, কোন্ টীকা তার কপালে দিয়ে এলে? আজ তুমি উন্নত মহান মাননীয় লোক, আর আমি হেয় ঘৃণ্য একটা পতিতা নারী; আজ তুমি আমার বিচারক, আমি অপরাধিনী। আমায় তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে আজ মুখ ফুটে মৃত্যু-দণ্ড দিয়েছ, এ দণ্ড আমি মাথা পেতে আদর করে নিচ্ছি। নির্দ্দয় পুরুষ,—যদি শক্তি থাকতো এ নারীর, তোমার মত পুরুষকে আমি এমন শাস্তি দিতুম যা কল্পনাতেও কেউ কখনো আনতে পারে নি। তোমারই মত এক কামান্ধকে

হত্যা করেছি,—দেহটাকে নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলতে পারলুম না; জ্ঞান হয়েছিল, তাই বুঝেছিলুম, যদি প্রথমে এ জ্ঞান হতো—তোমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতুম না, নিজের সর্ব্বনাশ করতুম না।'

তাহার চোখ দিয়া সহসা ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

মিঃ ব্যানার্জি মুখ তুলিলেন। সম্মুখের পতিতা নারী তাঁহার কাছে দেবীর মত প্রতীয়মান হইল।

'মনীষা—'

মুখ ফিরাইয়া মনীষা বলিল,—'আর নয়। এই কথাটি বলব, তোমার হার তোমায় দেব বলে ডেকেছিলুম। কারও হাতে দিলে হয় তো এ পতিতার জিনিষ তোমার কাছে পৌছাত না; কারণ, তুমি ধার্ম্মিক—ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক, আর আমি,—আমি নরহত্যাকারিনী গণিকা মাত্র। সৌভাগ্যের তুঙ্গে তোমার আসন, দুর্ভাগ্যের শেষধাপে আমি; আজ তুমিও আমায় ঘৃণা করছো।'

'ঘৃণা,—মনীষা—'

মিঃ ব্যানার্জি বন্দিনীর হাত চাপিয়া ধরিলেন। হাত ছাড়াইয়া মনীষা সরিয়া দাঁড়াইল, সেই সময়ে প্রহরী আসিয়া পড়িল।

'আচ্ছা আসুন, নমস্কার—'

শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত কপালে ঠেকাইতে গিয়া ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল, সেই শব্দ মিঃ ব্যানার্জির বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল ঝন্ঝন্, ঝন্ঝন্।

পরদিন প্রত্যূষে হত্যাকারিনীর ফাঁসি হইয়া গেল।

গোপনে বিচারকের চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল পতিতার উদ্দেশ্যে ঝরিয়া পড়িল।

মাটির টান

শ্রীসুনীতি দেবী

ছোট অঙ্কুরটি মাটির তলায় অন্ধকারে আলোর সন্ধানে পথ হাতড়ায়। ধীরে ধীরে মাটি ফুঁড়ে যখন বাইরে এসে আলোর স্বরূপ দেখে তখন তার প্রাণ আনন্দে বলে ওঠে—এই! এই! এরই স্বপ্নে আমার জন্মের পূর্ব্ব হতে সমগ্র অন্তর ভরা ছিল।

কিন্তু ভাবে ধরা ছোঁয়া যায় না ত!...তখন তার মন জিজ্ঞাসা করে,—যার রূপে ভুললাম, সে কোথায়?

দেহ বলে—তার জ্যোতি এসে পৌচেছে, কিন্তু সে বোধ হয় দূরে।

মন বলে—তবে চল তার কাছে। দেহে তার স্পর্শ চাই।

আলোর সত্বাতে ডুবে থেকেও সে বোঝে না আলো কোথায়! মাটির মধ্যে শিকড় যত দৃঢ় করে তাকে বাঁধে তার বাইরের সন্ধানে ততই সে আকুল হয়ে ওঠে। তার দেহের অধীরতা বেড়ে চলে, তাই তার শাখাপ্রশাখা উর্দ্ধে বাহু বিস্তার করে, তাই তার কিশলয়গুলি দুলে দুলে ওঠে, তাই বর্ষে বর্ষে ফুল ফলের অঞ্জলি নিবেদন করে, পূজা চলে,—তবু তাকে যেন একেবারে নিজের করে পাওয়া যায় না। পত্রপুষ্প ম্লান হয়ে মাটির বুকে খসে পড়ে। মাটির রসে প্রাণবন্ত হয়ে আবার নূতন পত্রপুষ্পে সেজে আলোর অভিসারে সে উর্দ্ধদিকে চলে।

পাখী তার ডালে বাসা বাঁধে। ভোরে তাকে আলোর স্তব শোনায়, সারাদিন দীপ্তিসাগরে নেয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এলে গাছ তাকে জিজ্ঞাসা করে,—তার কাছ থেকে কি নিয়ে এলে ভাই?

পাখী বলে—গান আর প্রাণের খোরাক।

গাছ বলে—কেমন করে ফিরতে পার তুমি? আমি যদি তোমার ডানা পেতাম ত তার কাছে চিরদিনের মত চলে যেতাম—আর ফিরতাম না এই নোংরা মাটির বুকে।

পাখী তন্দ্রার ঘোরে বলে—কি জানি ভাই!

এমনি করে কত বছর কেটে যায়। শেষে প্রবল ঝড় এসে গাছের শিকড়শুদ্ধ নাড়া দিয়ে যায়। গাছ বলে—আমার নিজের শক্তিতে বন্ধন কাটাতে পারি নি, ওগো রুদ্র বন্ধু, তুমি এই শিকড় উপড়ে উড়িয়ে নিয়ে চল আমার আলো-বাতাসের রাজ্যে।

অট্টহাস্যে দিগন্ত কাঁপিয়ে ঝড় বলে—তাই হবে। ঝাকুনিতে গাছের শিরা-উপশিরা টন্‌টন্‌ করে ওঠে। গাছ বলে—হায়রে মিথ্যা মায়া—তবু তারও এত ব্যথা!

মাটির সঙ্গে বন্ধন ঘুচল প্রচণ্ড আঘাতে। ঝড়ের বেগে খানিকটা দূর ছটকে গিয়ে পড়তে হল ঐ মাটিরই কোলে!

কিন্তু শিকড়গুলো ছিঁড়ে গেছে, অসাড় হয়ে গেছে,—যাকে ছেড়ে গেছে তার সঙ্গে আর জোড়া লাগে না।

তখনও আলো আসে, কিন্তু তার দীপ্তিতে গাছকে বিকশিত করে তোলে না, তার দাহনে পুড়িয়ে মারে। ধীরে ধীরে গাছ শুকিয়ে যায়। তার দেহ মাটিতে মিশে এক হয়ে যায়,—রূপের পার্থক্যটুকুও থাকে না—একেবারে একাকার!

দরিদ্রের ভগবান

শ্রীগোলাপলাল দে

তখনও ওঠে নি সূর্য্য ভাল করে' ফোটে নি ক' আলো,
বহে সিক্ত শীত বায়ু চারিদিকে ছায়া কালো কালো;
পাখীরা ঝাড়িয়া পাখা সেই মোটে শাখা হতে ডাকে,
সুপ্তি হতে চক্ষু মেলি নিদ্রিতেরা একে একে জাগে;
তখনও ভাবে নি তারা, কেটে গেছে দীর্ঘ দিবা রাত,
লাগিতে হইবে কাজে এখনই হইলে প্রভাত;
হেন কালে সুরু হল চিরন্তনী 'ওগো ভিক্ষা দাও';
'আমি অন্ধ' 'আমি খঞ্জ' 'ওগো মোর পানেতে তাকাও';
'আমি হেথা কুষ্ঠরোগী' 'আমি পঙ্গু' 'আমি পক্ষাঘাত',
'কোম্পানীর পাটকলে আমি হায় হারায়েছি হাত';

'পতি পুত্র হারায়েছি মারী রোগে অভাগিনী নারী,'
'আমি অভাগ্যের পুত্র আজীবন আমিও ভিখারী';
'কে কোথায় আছ ওগো দয়া কর দুটি ভিক্ষা দাও',
'একটি পয়সা দিয়ে অভাগারে আজিকে বাঁচাও';
'এক মুঠা দাও যদি চিরদিন গাব জয় গান',
'আশীর্ব্বাদে রাজা হবে যাচি মোরা ডাকি ভগবান।'

হা দরিদ্র, হারে মূর্খ, নির্য্যাতিত দীন অসহায়,
মূঢ়তার স্পর্দ্ধা দেখে এত দুঃখে তবু হাসি পায়;
জন্ম হতে জন্মান্তর ঊষা হতে দীর্ঘ দিনমান,
শুধু ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে কোনমতে বাঁচে যার প্রাণ;
তার যাচ্ঞা আশীর্ব্বাদ, কিবা ফল তার জয়গান!
ডাকিস্ সে কারে তোরা, ভিক্ষুকের কোথা ভগবান?
রাজা হই নাহি হই তাতে তোর কিবা আসে যায়?
তুই যে পথের পাশে সেখানেই রহিবি ত ঠায়!
মোটে ক'টি রাজা আছে তাহাতেই তোর এত সুখ,
মোরা সবে রাজা হ'লে দলে শুধু বাড়িবি ভিক্ষুক!
তার চেয়ে পূজা কর যাচ্ শক্তি তাহাদেরই কাছে,
ওই যারা তোর দুঃখে এতটুকু চীর পরে আছে;
জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ত্যজি' ক্ষুধা তৃষ্ণা সর্ব্বসুখ সাধ,
নারায়ণ বলি তোরে পূজা করে' চায় আশীর্ব্বাদ;
কোন্ বাণী বলে ওরা শোন্ ওরে শোন্ পেতে কাণ,
দরিদ্রের বন্ধু ওরা দরিদ্রের ওরা ভগবান।

যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জয়পুরে 'বিং এডো-ওয়ার্ড মেমোরিয়্যাল হোটেলের' দু'তিন-খানি বড় ঘর দখল ক'রে 'ইষ্টার্ণ সিনেমা সিণ্ডিকেটের' দল তাদের আড্ডা বসিয়ে ছিল।

ঠিক কোন্ জায়গা-টাতে বেশ ভাল ছবি তোলা যেতে পারে তাই স্থির করতেই ওদের এক সপ্তাহের উপর কেটে গেছল। নানাস্থান বারবার পরিদর্শন ক'রে শেষে সহরের বাইরে 'রামনিবাসবাগ' নামে যে প্রকাণ্ড রাজোদ্যান আছে, সেইটিই ছবি তোলার পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলে তাদের অধিকাংশের মতে নির্দ্ধারিত হ'ল।

রামনিবাসবাগে ছবি তোলার আর একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, এই বাগানের মধ্যেই জয়পুরের সুন্দর 'যাদুঘর' ও পশুশালা ছিল। জয়পুরের এই যাদুঘরের বাড়ীটি স্থাপত্য শিল্পের দিক দিয়ে এত সুচারুরূপে গঠিত যে চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের উৎসাহী যুবকেরা তাদের ছবির মধ্যে ওই বাড়ীর সৌন্দর্য্যটা ধরে' রাখবার প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারলে না!

কাজে কাজেই তাদের ছবি তোলার মেলা বসল ঐ যাদুঘরের গায়েই!

উদিয়মান সাহিত্যিক কনক চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'জন্মান্তর' শীর্ষক নূতন উপন্যাসখানিকে চলচ্চিত্র নাট্যে রূপান্তরিত ক'রে নিয়ে ছবি তোলা হবে এটা বহু পূর্ব্বেই স্থির হ'য়েছিল, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ভূমিকা বিতরণ করা হয় নি। কারণ ওই ভূমিকা বিতরণ নিয়ে দু'দিন আগে হোটেলের ঘরের মধ্যে মহা গণ্ডগোল বেধেছিল।

সিধু যদিও এই দলের নেতা হয়ে এসেছিল, কিন্তু ছবি তোলার ব্যাপারে সেই কার্ণিক খাওয়া বুক চেস্তা বাবাই ছিল প্রধান। 'জন্মান্তর' অভিনয়ে নায়কের অংশে প্রকাশকে নামাতেই হবে এই ছিল বাকার জেদ্; তাই সিধু তাকে সেদিন যতই বোঝাবার চেষ্টা করলে যে সে হবার উপায় নেই। প্রকাশ কিছুতেই মেয়েদের সঙ্গে একত্রে অভিনয় করতে রাজি নয়,—বাকা ততই বলে—কেন? তাতে কি দোষ?

সিধু অবশেষে নিরুপায় হয়ে প্রকাশকে এনে বাকার কাছে হাজির করে দিয়েছিল।

প্রকাশ যে অবস্থার মধ্যে পড়ে এদের সঙ্গে জয়পুরে আসতে বাধ্য হ'য়েছিল তার সে অবস্থার যদিও এখনও কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি তথাপি সে এই অল্পদিনের মধ্যেই এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এদের সঙ্গ যেন সে আর সহ্য করতে পারছিল না। তাদের সেই প্রতিদিনের মদের আসর, অশ্লীল ইয়ার্কী ও অভদ্র পরিহাস এবং নিত্যই অন্তত এক চুমুক মদ খাবার জন্য প্রকাশকে সেই দলশুদ্ধ লোকের একে একে করজোড়ে মিনতি, পীড়াপীড়ি অনুরোধ জয়পুরে তার জীবন একেবারে দুর্ব্বহ করে তুলেছিল!

প্রকাশ মনে করেছিল যে, প্রথম প্রথম দু' একদিন বলে শেষটা ওরা তার সম্বন্ধে একেবারে হাল ছেড়ে দেবে এবং সেও নিশ্চিন্ত হবে।—কিন্তু এতদিনেও তাদের মধ্যে সে রকম কোনও লক্ষণ দেখতে না পাওয়ায় সে শুধু বিস্মিত নয় বিপদগ্রস্তও হয়ে উঠেছিল! কারণ সঙ্গীরা নিজেরা এতদিন তাকে বগে বগে অকৃতকার্য্য হয়ে এইবার তাদের সঙ্গের প্রধানা অভিনেত্রী কুমুদ ও কুসুম প্রভৃতির দ্বারা

তাকে সেই একই অনুরোধ করাতে আরম্ভ করেছিল।

প্রকাশ একদিন সিধুকে গিয়ে বল্লে, 'দেখো, তোমরা যদি আমার উপর এই রকম অত্যাচার করতে সুরু করো তাহলে কিন্তু আমাকে জয়পুর ছেড়ে পালাতে হবে। জানো তো কখন ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশিনি। ট্রেণে আসবার সময় যদি জানতে পারতুম যে, তোমাদের সঙ্গে অভিনেত্রীরাও আছেন তাহলে আমি কখনই জয়পুরে আসতুম না।

সিধু বললে, কেন, ওদের অপরাধ কি যে তুমি ওদের সঙ্গে মিশবে না? আমরা যেমন অনেকখানি পেটের দায়ে এবং কতকটা সখ মেটাবার জন্য এখানে অভিনয় করতে এসেছি, ওরাও তো ভাই ঠিক তাই করতেই এসেছে। আমাদের সঙ্গে মিশতে যদি তোমার না কোনও বাধা থাকে তাহলে ওদের বেলাও সেটা থাকা উচিত নয়।'

প্রকাশ বললে,—'কিন্তু ওরা বেশ্যা!'

সিধু বোধ হ'ল যেন তার উদগত হাসিটা চেপে জোর করে একটু বেশী রকম গম্ভীর হয়ে বললে,—'কে বললে? এই খানেই তো তুমি দেখছি ওদের সম্বন্ধে মস্ত একটা ভুল ধারণা করে বসে আছো। ওরা ওদের শিক্ষা ও গুণপনার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করতে এসেছে, ওরা তো আর ওদের দেহ বিক্রয় করে অর্থ উপার্জ্জন করতে আসে নি? অভিনেত্রীদের বেশ্যা বললে তাদের শুধু অপমান করা নয় তাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে।'

প্রকাশ খানিকটা ইতস্তত করে বললে—'ওরা তবে মদ খায় কেন?'

সিধু বললে,—'মদ তো আমরাও খাই হে!'

—তোমরা বওয়াটে ছেলে তাই মদ খাও।

—ওরাও বওয়াটে মেয়ে তাই মদ খায়।

—বাঃ তাবলে মদ খাবে? ওরা কখনই ভদ্র মহিলা নয়!'

—কেন? কি অভদ্রতা করেছে ওরা তোমার সঙ্গে?

—আমাকে মদ খেতে অনুরোধ করছে কেন?

—সে তো আমরাও করে থাকি!

—তোমরা আমার বন্ধু সেই সাহসে করো, কিন্তু ওরা কিসের জোরে—

বাধা দিয়ে সিধু বললে, 'ঠিক ঐ কারণেই। আমরা তোমার বন্ধু আবার ওরা আমাদের বন্ধু সুতরাং ওদেরও তোমাকে বলবার অধিকার আছে বৈকি?'

প্রকাশ খানিক্ষণ নিরুত্তর থেকে বললে, 'কিন্তু আমি এ সব পছন্দ করি নে!'

সিধু এবার একটু মুচকে হাসতে হাসতে বল্লে, 'কিন্তু পছন্দ যে করতেই হবে দাদা!'

—তুমি হবে আমাদের ফিল্মের হিরো আর ওদেরই মধ্যে একজন সাজবে হিরোইন! নাটকের অভিনয়ে এক সময় তোমাকেই ঐ হিরোইন একজনকে হরণ করতে হবে যে! তখন?

এ কথা শুনে প্রকাশের মুখ একেবারে শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল! সে প্রায় কাঁদ' কাঁদ' হ'য়ে বল'লে,—'না ভাই, সে আমি পারবো না! জানোই তো জীবনে কখন আমি থিয়েটার করি নি, ওসব আমার আসে না তবু তোমরা জোর করে আমাকে সাজাতে চাইলে, সব দেখিয়ে শুনিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে বললে তাই আমি রাজি হয়েছিলুম, কিন্তু তখন তো বলো নি যে মেয়েদের সঙ্গে আমায় অভিনয় করতে হবে!'

—কেন, মেয়েদের সঙ্গে অভিনয় করলে কি তোমার জাত যাবে?

—তা আমি জানি নি। দেখো তর্ক করে তোমাদের আমি হয় ত বোঝাতে পারবো না। কিন্তু ঠিক মদ খেতে আমার যেমন ঘৃণা বোধ হয়, এই সব মেয়েদের সঙ্গে একত্রে অভিনয় করতেও আমার ঠিক তেমনিই বিশ্রী লাগে। তবু যদি তোমরা বেশী পীড়াপীড়ি করো তাহলে কিন্তু আমি কলকাতায় পালিয়ে যাবো তা ব'লে রাখলুম।

সিধু তখন প্রকাশকে অভয় দিয়ে বললে,—'আচ্ছা যাতে তোমায় না সাজতে হয় আর মদ খাবার জন্যে যাতে তোমায় কেউ আর বিরক্ত না করে আমি সে ব্যবস্থাও করবো। কনক চাটুয্যে নিজেই তার বইয়ের হিরো সাজতে চেয়েছিল, তাকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি যেন হেম

দাসকেও সঙ্গে নিয়ে চলে আসে। সাজ সরঞ্জাম সীন, সেটিং—এ সবের জন্য একজন ভাল আর্টিষ্টও আমাদের নিতান্ত দরকার।

এই ঘটনার দু' একদিন পরেই ভূমিকা বিতরণ নিয়ে গোলমালটা বেধেছিল। সিধু কিছুতেই বাঁকাকে বোঝাতে না পেরে যখন প্রকাশকে এনে তার কাছে হাজির করলে, বাঁকা বললে,—'প্রকাশদা' ওসব ছেলেমানুষী আপত্তি তোমার টেঁকবে না ভাই, মদ আর মেয়েমানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। এই দুটো জিনিষ মর্ত্ত্যকে স্বর্গ করে তুলতে পারে। এ যদি তুমি উপভোগ না করো তাহলে তোমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে কিছুতেই হ'তে দেবো না! Life! Life! বুঝলে? মানুষ হয়ে জন্মেছ যখন তখন মানুষের মতনই জীবনটাকে সার্থক করে নাও। আরে তোমরা সব ভালছেলে হয়ে পড়েই তো এ জাতটাকে আজ মারতে বসেছো। পৃথিবীর তিন ভাগ লোক বিধাতার ওই শ্রেষ্ঠদান কেমন মাথা পেতে নিয়েছে—তাই তারা স্বাধীন। তারা নির্ভিক, তারা দীর্ঘজীবী। তুমি ও সমস্ত সঙ্কীর্ণতা আর কুসংস্কার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বুকটাকে দরাজ করে আর হৃদয়টাকে উদার করে স্ফূর্ত্তি করতে লেগে যাও ভাই। জীবনটা ভোগ করে নাও। তোমাকেই আমাদের হিরোর পার্টটা প্লে করতে হবে।

প্রকাশ জোড়হাত করে বললে,—'আমাকে মাপ করো ভাই, আমি ও পারবো না। কনক এসে তোমাদের হিরো সাজবে। সিধু তাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে। সে হেমদাসকে নিয়ে আজ কালের মধ্যেই এসে পড়বে।'

প্রকাশের কথাটা বাঁকা যেন ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারলে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিধুর মুখের দিকে চাইতেই সিধু হাসতে হাসতে বললে,—'তোমার হিরোর জোগাড় না ক'রে কি আর আমি প্রকাশকে রেহাই দিতে চেয়েছি মনে করো? তিন দিন আগে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি! খুব সম্ভব কালই কঙ্কা আর হেমা এসে হাজির হবে!'

বাঁকা উৎসাহে একেবার লাফিয়ে উঠে সিধুর দুহাত ধ'রে সজোরে করমর্দ্দন ক'রে ব'লে উঠলো,—'বেঁচে থাক্ দাদা, যাদের সিদ্ধেশ্বর নেই তাদের কেউ নেই!

প্রকাশ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(১১)

স্বামীর সঙ্গে জয়পুরে এসে প্রথম দু'চার দিন বিভা বেশ একরকম ছিল। নূতন দেশে নূতন জায়গায় এসে নূতন বাড়ী ও নূতন অবস্থার মধ্যে পড়ে তার দিনগুলো যেন এক স্বপ্নের আর ছায়ার ভিতর দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু এই নূতনের মোহ বেশীদিন তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারলে না। হঠাৎ তার সেই ছেড়ে-আসা ছোট বাড়ীখানি স্নেহময় পিতা আদরের ছোট বোন নিভা, সকলের জন্য মনটা কাতর হয়ে উঠল। অবিবাহিত জীবনের অসংখ্য স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গগতা জননীর কথা বার বার মনে পড়ে তার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠতে লাগল আর মনে পড়তে লাগল আর একজনের কথা—মা' তার জীবিত থাকলে হয় ত' আজ সে অন্য একজনের পত্নী হ'তে পারতো না!

প্রকাশ নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে পিতার পত্রে এ সংবাদ পেয়ে পর্য্যন্ত সে আর কিছুতেই মনকে বুঝিয়ে স্থির' হ'তে পারছিল না! সেই মনের আবেগ নিয়েই সে এককথায় জয়পুরে চ'লে এসেছে! তার কেবলই মনে হচ্ছিল, তার প্রকাশদা' আজ গৃহত্যাগী হয়েছে। বৃদ্ধ পিতামাতা—একমাত্র স্নেহের বোন্—অগাধ বিষয় সম্পত্তি—এ সমস্তই হেলায় পরিত্যাগ ক'রে এই যে সে আজ বিবাগী হ'য়ে গেছে এ কার জন্য? প্রকাশ যে তাকে কতখানি ভালবাসে তার এত বড় পরিচয় পেয়ে বিভার বুকখানা যত বারই আনন্দে ও হর্ষে স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌তে চাইছিল, তত বারই কিন্তু একটা অপরাধের অপরিসীম লজ্জায় ও অনুতাপে তার যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সে কেবলই ভাবছিল এ তার দোষ। এই যে তার প্রকাশদা আজ কাউকে কিছু না বলে একেবারে দেশ ছেড়ে চলে গেছে এ শুধু তার উপর অভিমান করে।

মনে পড়তে লাগল তার সেই ফটো তোলার দিনের

কথা! সেই যেদিন প্রকাশদা'কে সে বোধ হয় শেষ চা ও হালুয়া তৈরি ক'রে খাইয়ে এসেছে। একটি একটি ক'রে সেদিনের প্রত্যেক কথাই সে স্মরণ ক'রে আলোচনা ক'রছিল। প্রকাশ সে দিন বলেছিল সে বিদ্রোহী হবে। মানুষের মিথ্যা বংশ মর্য্যাদা ও কৃত্রিম আভিজাত্য গর্ব্ব যাতে আর নির্দ্দোষ নর-নারীর বুকের উপর দিয়ে তাদের নির্মম নিষ্ঠুরতার রথচক্র অবাধে চালিয়ে যেতে না পারে সে তাই দেখবে! ডেকেছিল সে তাকেও সাহায্য করতে—কিন্তু—ছিছি; সে পোড়ারমুখী সেই মিথ্যা মর্য্যাদা ও তুচ্ছ মান রক্ষা করবার জিদ্ নিয়েই তো সেদিন প্রকাশকে প্রত্যাখ্যান করেছে!...

একটা কথা মনে করে বিভা হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লো!—আত্মহত্যা করে নি তো? নইলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কোথায়? আমার কাছ থেকে এতখানি নিষ্ঠুরতা প্রকাশদা' নিশ্চয়ই আশা করে নি। তার প্রাণে এতবড় নিদারুণ আঘাত দিয়েছি যে, সে বেচারি সহ্য করতে না পেরে আজ দেশত্যাগী হয়েছে। হায়, হায়, তার দোষেই আজ এমনটা হ'ল! হ্যাঁ এ তারই ত দোষ! নইলে প্রকাশদা তো তার বাবার অমতেও তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। আমার জন্য সব ছাড়তে চেয়েছিল। যে তুচ্ছ একটা পারিবারিক মান অপমানের ঘটনা নিয়ে তার সে অগাধ ভালবাসাকে আমি পায়ে ঠেলেছি। আমার জীবনের সব দুঃখ সব দৈন্য সকল অভাব ও গ্লানি যে তার গভীর অতুল প্রেমের নিবিড়তায় ঢেকে দিতে পারতো সেই দেবতার আমি অপমান করিছি!... বিভার দুই চোখ জলে ভরে উঠ্‌ল।...কেন সে প্রকাশকে না বলিবার আগে একবার তার বাবাকে গিয়ে প্রকাশের বিদ্রোহী হবার প্রস্তাবটা জানাল না? আপশোসে অনুতাপে অনুশোচনায় তার হৃদয় যেন বিকল হ'য়ে পড়ল! কবে কোন্ পাড়ার কোন্ মেয়ে পিতৃগৃহের সঙ্গে শ্বশুরকুলের বিবাদ হতে অসঙ্কোচে পিতামাতাকে পরিত্যাগ ক'রে তার স্বামীরই অনুবর্ত্তিনী হয়েছিল! তারও কি সেইরকম করাই উচিত ছিল না? সাধ্বী পত্নীর কর্ত্তব্যই তো তাই! হ্যাঁ, পত্নী বই কি!—প্রকাশদা'ই তো তার প্রকৃত স্বামী! ছেলেবেলায় মা তো প্রকাশের সঙ্গে তার সত্যিই বিয়ে দিয়েছিলেন, সে বিয়ে মন্ত্র-তন্ত্রহীন—কিন্তু মায়ের কল্যাণ কামনা ও শুভাশীষ তো তার মধ্যে ছিল। সেই যে এক দিন বিকেল বেলা এক ছড়া ফুলের মালা নিয়ে তিনি হাসতে হাসতে আমার গলা থেকে খুলে প্রকাশদা'র গলায় পরিয়ে দিয়ে উলুধ্বনি ক'রে বলেছিলেন—যা তোদের মালা বদল করে বিয়ে হয়ে গেল—প্রকাশ আজ থেকে আমার সংসারের জামাই হ'ল!... তারপর মা যতদিন জীবিত ছিলেন প্রকাশদা'কে বরাবর জামাই বলে ডেকেই আদর যত্ন করে গেছেন!

আজ আমার কাণ্ড দেখে তিনি উপর থেকে না জানি আমায় কি ধিক্কারই দিচ্ছেন! জগতের আর কেউ এ-কথা জানুক বা না জানুক তিনি ত জানলেন মেয়ে তাঁর দ্বিচারিণী!...

এই সব মানসিক অপরাধ ও কল্পিত অন্যায়ের তীব্র অনুভূতি বিভার অন্তরটিকে যখন একান্ত কাতর ক'রে তুলেছে, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা শেষ ক'রে নির্ম্মল যেন সেদিন একটু ত্বরিত গতিতেই বাড়ী ফিরে এলো।

তার মুখেচোখে বেশ একটা প্রসন্নতার ভাব দেখা যাচ্ছিল। বিভা গান বাজনা ভালবাসে ব'লে সে আজ একটা ভাল 'আমেরিক্যান অর্গান' কিনেছে, সন্ধ্যের মধ্যেই সেটা বাড়ীতে এসে পড়বে, এই খবরটা দিয়ে বিভাকে খুশী করবার লোভে সে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে আজ শীগ্‌গির এসে পৌঁছেচে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে সে যখন নববিবাহিতা পত্নীর সেই বিষন্ন ম্লান মুখ, সেই অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ এবং সেই সজল চোখে একটা সকাতর বিহ্বল দৃষ্টি দেখ্‌লে, নির্ম্মলের মনের মধ্যে কি যেন একটা করুণ কাহিনীর একটা অস্পষ্ট আভাস জেগে উঠ্‌ল! সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের সে প্রসন্ন ভাব অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বিভার প্রতি গভীর সহানুভূতিতে তার অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল!

আমেরিক্যান অর্গান কেনার কথাটা আর নির্ম্মলের বলা হ'লো না। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—

'কি হয়েছে বিভা? প্রকাশদা'র সম্বন্ধে কি কোন দুঃসংবাদ—'

বিভা যেন চমকে উঠ্‌ল! সে বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি—কি শুনেছেন আপনি তাঁর সম্বন্ধে?

নির্ম্মল ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে থেকে বললে, 'আমি ত' কিছু শুনি নি বিভা! আজকে হঠাৎ তোমার এই কাতরতা দে'খে আমার সন্দেহ হচ্ছিল বুঝি বা—'

—'ওঃ! না, আর নূতন কিছু দুঃসংবাদ শুনি নি এখনও!...'

ব'লতে ব'লতে বিভা যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল। মুহূর্ত্তকাল কি ভেবে সে একেবারে নির্ম্মলের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে বললে, 'আমাকে মাপ করুন। আমি কিছুতেই কোনও মতেই আপনার স্ত্রী হ'তে পারবো না!'

বিভার মুখে সহসা আজ এই কথা শুনে নির্ম্মলের মনে বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা রইল না! বিভা যে কেন আজ তাকে এ কথা বললে তার কোনও সঙ্গত হেতু খুঁজে না পেলেও এটুকু সে বুঝতে পারলে যে, এই মেয়েটির মন আজ যে কারণেই হোক্ একান্ত সংক্ষুব্ধ হ'য়েছে; কিন্তু আক্ষেপ হল তার এই কথাটা ভেবে যে, এতখানি সহৃদয় ব্যবহার করা সত্ত্বেও সে এই মেয়েটির কাছে কোনও প্রতিদানই পেলে না! একটু ভারি গলায় সে বললে, বেশ ত', তা সে জন্য এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন? আমি তো সে অধিকার আজও পর্য্যন্ত দাবী করি নি বিভা! তোমার এ মাপ চাওয়া কি নিতান্ত বাহুল্য হ'য়ে পড়ছে না?—'

বিভাকে আস্তে আস্তে ধরে তুলে পাশের একখানি সোফার উপর বসিয়ে দিয়ে নির্ম্মল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তার সামনে ব'সে ব'ললে, 'তুমি শান্ত হও। আমার কথা বিশ্বাস করো—আমার কাছে তোমার কোনও আশঙ্কা নেই! তোমার অন্তরের আসনখানি আমি কোনও দিনই জোর ক'রে আমার জন্য বিছিয়ে নিতে চাইবো না! স্বীকার করি বটে আমি ভালবাসার ভিখারী, কিন্তু দস্যু-বৃত্তি করে তা ছিনিয়ে নেবার লোভ আমার একটুও নেই! তোমাকে বিবাহ করিছি ব'লেই সেই চেলী-টোপর আর আর গাঁট-ছড়ার দোহাই দিয়ে আমি তোমার কাছে থেকে কিছু পেতে চাই নে বিভা! কেননা আমার কাছে সে পাওয়ার কোনও মূল্য নেই! শাস্ত্র ও ধর্ম্মের জোরে আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারবশে পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরকের ভয়ে স্বামীকে দেবতা বলে, মেনে নিয়ে আমার কাছে তুমি যদি আত্মসমর্পন ক'রতে তাহ'লে আমি শুধু লজ্জিত নয়, দুঃখিতও হতুম!... আমার আশা ও বিশ্বাস ছিল যে, আমি তোমাকে ভালবেসে আমার আপনার ক'রে নিতে পারবো। আজ তোমার এই মর্ম্মান্তিক কথা শুনেও সে বিশ্বাস আমি হারাই নি বিভা! তুমি যদি মনে করো আমাদের মধ্যে সত্যকার স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া অসম্ভব—বেশ ত! তাতে ক্ষতি কি?—আমরা তো পরস্পরের বন্ধু হিসাবেও একত্র বসবাস করতে পারি! তাতে বোধ হয় তোমার কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। ...'

বিভার চোখে মুখে যেন একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল।

নির্ম্মল সেটা লক্ষ্য ক'রে প্রসন্ন মনে তার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, 'কেমন? তা হ'লে এই ঠিক রইল—কি বলো বন্ধু?'

বিভা সেই প্রসারিত হাত দু'টির উপর তার হাত দু'খানি তুলে দিতে আর দ্বিধাবোধ করতে পারলে না! এই মানুষটির অন্তরের ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্বের কাছে তার মাথাটি শ্রদ্ধায় আপনিই নত হ'য়ে পড়ল!

—ক্রমশ

সংস্কৃত-সাহিত্যে কাব্য-সমালোচনা

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

'সাহিত্য-সমালোচনা' কথাটির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের G. Sainstbury, Walter Pater প্রভৃতি বিখ্যাত সমালোচকদের লেখা বিরাট প্রবন্ধ ও গ্রন্থসকলের কথা মনে পড়ে। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ জাতীয় কোন সমালোচনার পুস্তক নাই, কিন্তু ইহা সত্ত্বে সমালোচনী বৃত্তি যে প্রাচীন ভারতে বিকাশ লাভ করে নাই তাহা মনে করা ভুল হইবে। উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা সংস্কৃত-সাহিত্যে কাব্য ও কবি বিচারের যে আদর্শ ছিল তাহার আলোচনা করিব। এই আদর্শ নানা স্থানে নানা অজ্ঞাত নামা কাব্যামোদীর রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

অর্থাৎ কবি কেমনটি হইলে ঠিক হয়, কবির আদর্শ কি তাহা লইয়াই আরম্ভ করা যাক্। অজ্ঞাতনামা সমালোচক বলিতেছেন।

বিদ্বৎকবয়ঃ কবয়ঃ কেবলকবয়স্তু কেবলং কপয়ঃ।
কুলজা যা সা জায়া কেবলং জায়া তু কেবলং মায়া॥"

যিনি কবি অর্থাৎ বিদ্বান্ অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান রাখেন তিনিই সত্যিকারের কবি। অন্যেরা যাঁহারা শুধু ছন্দোবন্ধন-কুশলতার চাপল্যে কবিতা রচনায় অগ্রসর হন অথচ বিবিধ বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন না তাঁহারা সাহিত্যের উদ্যানে এতখানি অনর্থ ঘটান যে, তাঁহাদিগকে শাখামৃগের দলে ফেলা অত্যুক্তি মনে হয় না। লোকে সাধারণত কবিতা লেখকগণকে যে বিশেষ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করে না ইহাই তাহার একটী প্রমাণ। কেবল 'থোড়-বড়ি-খাড়া'কে ছন্দের মুখে প্রকাশ করিলে কোন পাঠক তাহা ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিতে পারে? বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা ভাব-রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত না হইলে কবির প্রতিভা স্ফূর্তি পাইবে কিসে? জগতের শ্রেষ্ঠতম কবিগণ, যথা গেটে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত বলিয়া তাঁহাদের কাব্য কখনো কাব্যরসপিপাসুর নিকট একঘেয়ে লাগিতে পারে না। প্রাচীন ভারতের কালিদাসও যে তৎকাল প্রচলিত বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা-সমূহের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহা কবিবরের অনুরাগী মাত্রেই অবগত আছেন।

আর্টমাত্রেই যে একটা রূপের (form-এর) খেলা এ-কথা প্রাচীন কাব্যামোদীরা জানিতেন। একজন বলিতেছেন:

"ত এব পদবিন্যাসাস্তা এবার্থবিভূতয়ঃ।
তথাপি নব্যং ভবতি কাব্যং গ্রন্থনকৌশলাৎ॥"

একই কাব্য একই রূপ শব্দবিন্যাস ও একই রূপ অর্থ-গৌরব লইয়া রচিত হইলেও উহার বিষয়গুলি বা কথা-গুলি সাজাইবার কৌশলবশত নূতন হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ব্যাসের ও কালিদাসের শকুন্তলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই ত গেল-রচনা কৌশল সম্বন্ধে সাধারণ মত, তাহার পর অর্থ, অলঙ্কার, রস ইত্যাদির আপেক্ষিক গুরুত্বের আলোচনা।

"অর্থান্ কেচিদুপাসতে কৃপণবৎ কেচিত্ত্বলং কুর্বতে
বেশ্যাবৎ খলু ধাতুবাদিন ইবোদ্বধ্নন্তি রসান্।
অর্থালঙ্কৃতি সদ্রসদ্রবমুচাং বাচাং প্রশস্তিস্পৃশাং
কর্ত্তারঃ কবয়ো ভবন্তি কতিচিৎপুণ্যৈরগণ্যৈরিধ॥"

কবিদের মধ্যে একদল আছেন যাঁহারা ভাবেন একটা গুরু-গম্ভীর অর্থ বা তত্ত্ব না থাকিলে কবিতা হইল না, তাঁহারা কৃপণের মতই কৃপার পাত্র। এই উক্তিতে 'art

for art's sake' বাক্যের ক্ষীণ সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। একদল কবি আছেন যাঁহারা পদে পদে উপমা অনুপ্রাস যমক, শ্লেষ ইত্যাদি না লইয়া চলিতে চাহেন না। নগর-বীথির পার্শ্বে যাহারা নিজ শরীর ও সমাদরের বিপনী খোলে তাহারা যেমন চব্বিশ ঘণ্টা দেহকে নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া রাখে, তেমনি এই সব কবি কথায় কথায় অলঙ্কার বাহুল্য প্রকটিত করেন। আবার একদল আছেন যাঁহারা ধাতুবাদীর (alchemist) মত রসকে (ধাতুবাদীর পক্ষে পারদকে) উদ্বন্ধন (ধাতুবাদীপক্ষে Sublimation) করেন অর্থাৎ রসকে বিশুদ্ধ শান্তরসে (যাহা সকলের উর্দ্ধে) পরিণত করেন। কিন্তু অর্থ, অলঙ্কার ও সদ্রস ক্ষরিত হয় এমন প্রশংসাময় বাক্য যাঁহারা করিতে পারেন তাঁহারা কেবল বহু পুণ্যের ফলে জগতে জন্মগ্রহণ করেন।

কাব্য কিরূপ হইলে যে তাহাকে সফল বলা যায় তাহা বিবেচনা করিয়া জনৈক কাব্যরসিক বলেন :

"কিং কবেস্তস্য কাব্যেন কিং কণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥

অর্থাৎ তেমন কাব্যে কবির কি প্রয়োজন আর তেমন বাণে ধনুর্দ্ধরের কি প্রয়োজন যাহা পরের (ধনুর্দ্ধর পক্ষে শত্রুর) হৃদয়ে লাগিলে তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হয় না। কি চমৎকার কথা! যে কবিতা শুনিলে লোকে মাতিয়া না উঠে তাহা কি কবিতা? এই মত্ততা মানে যে logic-স্পর্শশূন্য aesthetic inspiration তাহা কি বিজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে? কাব্যের সঙ্গে হৃদয়-বৃত্তির একটা জ্ঞাতিত্ব আছে এবং সেই জ্ঞাতিত্বের সহজ প্রকাশই যে কবিতার উৎকর্ষ তাহা বুঝাইতে অন্য এক সমালোচক আর এক ভাবে বলিতেছেন :

'অবিদিত গুণাপি সুকবেভণিতি কর্ণেষু বমতিমধুধারাম্।
অনধিগত পরিমলাঽপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা॥"

অর্থাৎ মালতী মালার পরিমল ইন্দ্রিয় গোচর না হইলেও তাহা দেখিলে যেমন চক্ষু আকৃষ্ট হয় তেমনি ভালো কবির যে কবিতা তাহার গুণ আগে অন্যের কাছে না জানিয়া নিলেও তাহা কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে।

কিন্তু কেবল কবির কাব্যের উপরই প্রাচীন সমালোচ-কেরা ভাল মন্দের সমস্ত ভার চাপান নাই। 'সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিহীন পুচ্ছবিষাণহীন পশুরা বুঝিতে না পারিলেই যে কাব্য দুষ্ট হইবে এ-কথাও তাহারা জানিতেন। একজন সমালোচক বলেন :

"কবয়ঃ পরিতুষ্যন্তি নেতরে কবিসুক্তিভিঃ
নহ্যকূপারবৎ কূপা বর্দ্ধন্তে বিধুকান্তি ভিঃ॥"

কবিই শুধু কবিতা বুঝিতে পারে কারণ—সমুদ্রই শুধু চন্দ্রোদয়ে উচ্ছ্বসিত হয়, কূপ হয় না। যাঁহারা কাব্য আস্বাদন করিতে পারেন তাঁহারা যে কবির সহধর্ম্মী, প্রাচীন সমালোচকেরা তাহা জানিতেন। এ জন্যই তাহারা রসজ্ঞ সমালোচককে অতি উচ্চে স্থান দিতেন। একজন বলিয়াছেন :

"কবিঃ করোতি পদ্যানি লালয়ত্যুত্তমোজনঃ।
তরুঃ প্রসূতে পুষ্পানি মরুদ্বহতি সৌরভম্॥"

গাছ যেমন পুষ্প প্রসব করে কিন্তু বাতাসই তাহার সুগন্ধ চারিদিকে ছড়ায় কবির কাব্যে যে গুণ, থাকে তাহাও উত্তম অর্থাৎ রসজ্ঞ সমালোচকের মুখেই প্রচারিত হয়। বাস্তবিক জর্ম্মন সমালোচক না হইলে শেক্সপীয়রের সুনাম ও গৌরব কোথায় থাকিত?

মূর্খ সমালোচকের সমালোচনায় পীড়িত কোন মনস্বী কবি বলিতেছেন :—

মদুক্তিশ্চেদন্তর্মদয়তি সুধীভূয় সুধিয়ঃ
কিমস্যা নাম স্যাদলস পুরুষাঽনাদরভরৈঃ॥
যথা যূনস্তদ্বৎ পরম রমনীয়াঽপী রমণী
কুমারাণামন্তঃকরণ হরণং নৈব কুরুতে॥

"আমার যে কবিতা তাহা পণ্ডিতগণের অন্তর আমোদিত করিলেই হইল; অলস লোকেরা উহাকে অনাদর করিলে

তাহাতে আমার কি? কারণ যাহারা যুবক তাহারাই কেবল নারীর সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে; বালকে তাহার কি বুঝিবে?

একজন বিচক্ষণ সমালোচক কবি, রসজ্ঞ সমালোচক ও তত্ত্বান্বেষী বা বিশ্লেষক সমালোচনাকারীর তুলনা করিয়া কবিতার সঙ্গে এই তিনের সম্পর্ক কি তাহা সুন্দররূপে বুঝাইতেছেন।"

"কবিঃ পিতা পোষয়তি পালকো রসিকঃ পতিঃ।"
কবিতা যুবতের্নিং সোদরাস্ত বিবেকিনঃ॥"

কবি কবিতারূপ কন্যার জন্মদাতা উহাকে অর্থ অলঙ্কার ও রসদানে পালন করেন আর যিনি রসজ্ঞ তিনি উহার স্বামীসদৃশ; তিনি উহাকে পালন করেন অর্থাৎ মূর্খ সমালোচকের হাত হইতে রক্ষা করেন। আর যে সমালোচক উহার দোষগুণ বিচার করেন উহাতে নীতি-উপদেশ খোঁজেন তিনি উহার সহোদর সহোদরা অর্থাৎ কবিতার রস তাহার ভোগে আসে না, কবিতাকে জানিয়াই তাহার সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

যদি কবির স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রাচীনদের মতামত আমরা না জানি তবে কাব্য-সমালোচনা ও কবি সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পূর্ণ মতামত আমাদের জানা হইবে না। অর্থকামী রাজসভার কবিদের সম্বন্ধে কোন প্রাচীন সমালোচক বলেন:—

"কবিভির্নৃপসেবাসু বিত্তালংকারহারিণী।
বাণী বেশ্যেব লোভেন পরোপকরণী কৃতা॥"

কবির যে বাণী নৃপসেবায় ধনসম্পদের অর্জ্জনকারিণী তাহা গণিকার ন্যায় লোভবশত পরোপকরণী। বাস্তবিক অর্থের প্রয়োজনে কাহারও প্রীত্যর্থে কবিতা লিখিলে তাহা কখনো যে সত্য ও সুন্দরের মর্য্যাদা রাখিতে পারে না তাহা সহজেই বোঝা যায়। সুবিখ্যাত বাইরণ লিখিতেছেন:—

"He lied with such a fervour of intention—
There was no doubt he earn'd his laureate pension."

মীনকেতন

ন্যুট্ হামসুন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আঠেরো

বন্দুক নিয়ে কি কাণ্ডটাই করলাম,—পরে কত অনুতাপ হচ্ছে। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বুঝি। কোন কাজই হ'ল না তাতে, শুধু বহুদিন ধরে বিছানায় আটক রইলাম। কি অস্বস্তির মধ্য দিয়েই দিন কেটেছে, এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার ধোপানি রোজ এসে কাছে থাকত, খাবার কিনে আনত, ঘর গুছিয়ে দিত,—কতদিন? তারপর ...

ডাক্তার একদিন এড্ভার্ডার কথা পাড়লে। ওর নামটি আবার শুনলাম, ও কি করেছে কি বলেছে, সব শুনলাম,—যেন এ সবে আমার কিছু এসে যায় না, ডাক্তার যেন বাজে গল্প করছে। এত শিগ্গির লোকে ভুলে যেতে পারে, ভাবতে অবাক হয়ে যাই।

"আচ্ছা, এড্ভার্ডার সম্বন্ধে তোমার নিজেরই বা কি

মত? সত্য কথা বলতে কি, আমি ওর কথা কতদিন ভাবি নি। দাঁড়াও, তোমাদের মধ্যে একটা কিছু হয়েছে,—তোমরা এত কাছাকাছি থাক্‌তে। একদিন সেই দ্বীপে চড়ুইভাতির সময় তুমি ছিলে ভোজদাতা আর ও তোমার সহচরী। অস্বীকার করো না ডাক্তার, তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু বোঝাপড়া হয়েছে। না থাক্‌, আমার কথার উত্তর দিয়ে কাজ নেই,—আমাকে কেন বল্‌তে যাবে? এস, অন্য কথা পাড়ি। আবার কবে বাইরে বেরুতে পাব?"

কি বল্‌লাম তাই ভাবছিলাম বসে'। পাছে ডাক্তার কিছু বলে' বসে—তার জন্য এত ভয় কেন? এড্‌ভার্ডা আমার কে? আমি ওকে ভুলে গেছি।

ঘুরে ফিরে আবার এড্‌ভার্ডার কথা উঠ্‌ল,—ওকে বাধা দিলাম। কিন্তু শুন্‌তে এত ভয়?

"কেন এমনি করে' কথার মাঝে থেমে যাচ্ছ?" ও বল্লে:—"আমি ওর নাম বলি, এ কি তোমার সহ্য হয় না?"

বল্লাম,—"আচ্ছা, এড্‌ভার্ডার সম্বন্ধে তোমার সত্যিকারের মত কি, বল। শুন্‌ব।"

অবাক হয়ে আমারদিকে তাকাল ও।—"সত্যিকারের মত?"

"হয় ত তোমার কাছ থেকে আজ কিছু নতুন কথা শুন্‌ব। তুমি হয় ত ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছ, তোমাকে হয় ত ও গ্রহণ করেছে। তোমাকে অভিনন্দিত করব নাকি? না? সে কি?"

"তুমি বুঝি এই ভয় কর্‌ছিলে?"

"ভয়? ডাক্তার গো—"

চুপচাপ।

"না।" ও বল্লে—"প্রস্তাবও করি নি, আমাকে ও গ্রহণও করে নি। তুমিই হয় ত করেছ, কেমন? এড্‌ভার্ডার কাছে প্রস্তাব চলে না,—যাকে ও খুসি তাকেই ও নেয়। ও কি শুধু একটি মেঠো মেয়ে ভাব? শিশুকালে ও শাসন পায় নি,—একেবারে খামখেয়ালী, বড় হ'য়েও। উদাসীন? তাই বা কি করে বলি? উত্তপ্ত?—আমি বলি বরফ! তবে কি ও? একটুক্‌রো মেয়ে, ষোলো কি সতেরো,—ঠিক তাই। ঐ ঠুন্‌কো একটুখানি মেয়েকে বুঝ্‌তে যাও, দিশেহারা হয়ে গিয়ে নিজের বোকামিতে হাস্‌বে। ওর বাপ পর্য্যন্ত ওকে বশে আন্‌তে পারে নি, বাইরে ও বাপের' কথা একটু আধটু শোনে বটে, কিন্তু আদতে ওই কর্ত্রী। ও বলে, তোমার চোখ ঠিক জানোয়ারের চোখের মত ..."

"তোমার ভুল হয়েছে, ও নয়। আর কেউ।"

"আর কেউ? কে আবার?"

"তা জানি না। ওর মেয়ে-বন্ধুদের কেউ। এড্‌ভার্ডা না। দাঁড়াও, এড্‌ভার্ডাই ..."

"তুমি যখন ওর দিকে তাকাও, ও তাই ভাবে, ও বলে। কিন্তু তোমার কি তাতে মনে হ'ল যে তুমি ওর এক চুল কাছে এগিয়েছ? না। যত খুসি যেমন খুসি ওর দিকে তাকাও, ও দেখে ফেলে আপন মনে বল্‌বে,—'ঐ লোকটা আমার দিকে খুব চোখ মার্‌ছে, ভাব্‌ছে ওতেই আমাকে বেঁধে ফেল্‌বে!' এই ভেবে শুধু একটি চাউনি বা একটি কথার খোঁচায় তোমাকে দশ মাইল দূরে ঠেলে দেবে। তুমি কি ভাব্‌ছ আমি তাকে চিনি না? কত বয়েস ওর?"

"'৩৮ সালে ও জন্মেছে,—ও ত' বলে।"

"মিথ্যা কথা। আমি একদিন এমনি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওর বয়েস কুড়ি, যদিও পনেরো বলে' ওকে চালানো যায়। ও সুখী নয়,—ওর ঐ ছোট্ট মাথায় অনেক কিছুর বিপ্লব চলেছে। যখন ঐ পাহাড় ও সমুদ্রের পানে তাকিয়ে বেদনায় মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত করে' ওঠে,—তখন, সেইখেনেই ওর দুঃখ। কিন্তু অহঙ্কারে চোখের জল ফেল্‌ল না কোন দিন। একটু বেশি রকম কল্পনাপ্রিয়,—ও রাজপুত্রের জন্য প্রতীক্ষা করছে। তুমি নাকি একজনকে একবার একটা পাঁচটাকার নোট দিয়েছিলে,—সত্যি? কি ব্যাপার?"

"ঠাট্টা করেছিল। কিছু নয়।"

"আমারো সঙ্গে এম্‌নি করেছিল একবার। বছর খানেক আগে। ডাক-জাহাজে আমরা তখন ছিলাম,—জাহাজ ডাঙায় ভিড়েছে! বৃষ্টি পড়্‌ছিল ভারি ঠাণ্ডা। কোলে ছেলে নিয়ে একটি মেয়ে ডেকে বসে কাঁপ্‌ছিল।

এড্ভার্ডা তাকে শুধোল,—'বড্ড শীত কর্ছে তোমার?' কর্ছে বৈ কি। 'ছোট্ট খোকাটিরও?' হাঁ, নিশ্চয়ই। এড্ভার্ডা বল্লে—'কেবিনের মধ্যে যাও না কেন?' মেয়েটি বল্লে,—'ডেকের এই বাইরে-দিকটার টিকিট আমার।' এড্ভার্ডা আমার দিকে তাকাল। বল্লে—'এই মেয়েটির ডেকের বাইরে দিকের টিকিট।' তাতে কি? কিন্তু ওর চাউনি বুঝ্তে ত দেরি হ'ল না! খুব বড়লোক ত' নিজে নই, যাই পাই তার জন্যে কি ভীষণ খাটতে হয়, এক আধলা খরচ করবার আগে দু' বার ভাবি,—চলে গেলাম সেখান থেকে! মেয়েটিকে কেউ সাহায্য করুক এই যদি এড্ভার্ডা চায়, তবে ও নিজেই দিক্ না। ও আর ওর বাপ আমার চেয়ে ঢের টাকাতে! সত্যি সত্যি এড্ভার্ডাই দিল। সে দিক দিয়ে ও চমৎকার,—কে বলে ওর হৃদয় নেই? কিন্তু আমি ঐ মেয়েটি ও তার ছেলের সেলুন্-ভাড়া দিই এই ত' ও সর্ব্বান্তঃকরণে চাইছিল,—ওর দুই চোখে তাই ত' পড়ছিলাম। তারপর কি হল, ভাবতে পার? মেয়েটি উঠে ওকে ধন্যবাদ জানালে। 'ধন্যবাদ আমাকে নয়।' এড্ভার্ডা বল্লে—'ঐ ভদ্রলোকটিকে।' আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলে। মেয়েটি আমাকেও ধন্যবাদ দিলে,—কি বল্ব? চলে গেলাম শুধু। ঐ ওর রকম। কিন্তু ওর বিষয় আরো কত কথা বলা যায়। মাঝিকে সেই পাঁচটাকা,—ও নিজেই দিয়েছিল তা। তুমি যদি দিতে তবে ও ওর দুই বাহু দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে সেখেনেই চুম্বন কর্ত। একটা ছেঁড়া জুতোর জন্য এতগুলি টাকা খরচ করলে তুমি ওর মনে নিশ্চয় রাজপুত্রেরই মতন বিরাজ করতে,—তা ওর ভারি মনোমত হ'ত—তোমার কাছ থেকে ও তাই আশা কর্ছিল। তুমি তা কর্লে না,—ও নিজে তোমার নামে তাই কর্লে। ঐ ওর ধরন,—খামখেয়ালি কিন্তু ভারি হিসেবী।"

"এমন কি কেউ নেই, ওকে জয় কর্তে পারে?" শুধোলাম।

সে প্রশ্ন এড়িয়ে ডাক্তার বল্লে,—"ওর দরকার শাসন। বড্ড বাড় ওর,—যা খুসি তাই ও করে, আর সব সময়েই জেতে। কেউ ওকে অমান্য করে না,—কিছু না কিছু করবার হাতের কাছে আছেই ওর। আমি ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করি, দেখেছ? পাঠশালার মেয়ে, খুকী। ওকে হুকুম করি, ওর কথা বলার ধরনকে নিন্দা করি, কড়া চোখ রাখি,—ও কি কিছু বোঝে না, ভাব? গর্ব্বিত, কঠিন,—প্রত্যেকবার ওর ঘা লাগে, প্রত্যেকবার অহঙ্কারে ও মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়। কিন্তু ওর সঙ্গে অমনিই ব্যবহার করা উচিত। তুমি যখন এখানে প্রথম এলে,—আমি তখন ওর সঙ্গে প্রায় একবছর মিশছি,—সব ঠিকঠাক হচ্ছিল,—ও আর যেন প্রতীক্ষা কর্তে পারছিল না, বেশ বুঝ্ হয়ে উঠছিল। তুমি এসে সব উল্টে দিলে,—সব। অম্নি করেই যায় সব,—একজন ছাড়ে আরেকজন এসে তুলে নেয়। তোমার পরে তৃতীয় আরেকজন আস্বেন,—নিশ্চয়ই,—তুমি তাঁকে চেন না।"

মনে হল, ডাক্তার কিসের যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে। বল্লাম—"এত কষ্ট করে' আমাকে এ লম্বা গল্প করবার কি দায় পড়েছে তোমার, ডাক্তার? কেন? ওর গল্প কি আমাকেও কিছু বল্তে হবে?"

"আবার একেবারে আগুন।" আমার কথায় কানও পাত্ল না, বলে চল্ল—"জিগ্গেস করেছিলে, কেউ ওকে পেতে পারে কি না। কেন পারবে না? ও ওর রাজপুত্রের জন্য প্রতীক্ষা কর্ছে, সে এখনো আসে নি। বারে বারে ও ভাবে, তাকে পেয়েছে বুঝি, বারে বারে ওর ভুল ভাঙে। তোমাকেও ও ভেবেছিল,—বিশেষত জানোয়ারের চোখের মত তোমার চোখ। হা হা! তোমার সমরসজ্জাটা সঙ্গে নিয়ে এলে পার্তে, কাজে লাগ্ত। কেন ওকে পাবে না? কতদিন ওকে দেখেছি, বেদনায় দুই হাত মুচড়ে মুচড়ে ও কার প্রতীক্ষা করছে, কে এসে ওকে কেড়ে নিয়ে যাবে, ওর প্রাণ ও সর্ব্বাঙ্গের ওপর রাজত্ব কর্বে ... হাঁ, একদিন সে আস্বে, হঠাৎ,—একেবারে অসাধারণের মতো। ম্যাক্ ভ্রমণে বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে ওঁর। অনেকদিন আগে এমনি একবার বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে একটি লোক নিয়ে এসেছিল।"

"লোক নিয়ে এসেছিল?"

"সে কোন কাজের নয়।" মলিন হাসি ডাক্তারের মুখে,—"আমারই বয়সী সে,—আমারই মতন খোঁড়া। রাজপুত্র হতে পারল না।"

"তারপর চলে গেল? কোথায় গেল?" ওর দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলাম।

"চলে গেল? কোথায়?—জানি না।" অস্পষ্ট ডাক্তারের কথা,—"অনেক্ষণ বাজে বক্‌ছি আমরা। তোমার পা,—তুমি এক সপ্তাহের মধ্যে বেরুতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, চল্লাম নমস্কার।"

উনিশ

কুটীরের বাইরে নারীকণ্ঠ,—রক্ত যেন মাথায় উঠে এল,—এড্‌ভার্ডা।

"গ্লাহ্‌ন-গ্লাহনের অসুখ, শুন্‌লাম।"

ধোপানি বাইরে ছিল, বল্লে—"প্রায় সেরে উঠেছেন।"

ওর মুখে আমার নমোচ্চারণটা যেন একেবারে হৃদপিণ্ডে এসে লাগ্‌ল, ও দু'বার আমার নাম বলেছে, কত ভালো লাগ্‌ছে তাতে। পরিষ্কার মিষ্টি ওর গলা।

টোকা না দিয়েই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ঢুকে আমার দিকে চাইল ও। হঠাৎ মনে হ'ল,—যেন সেই পুরোনো দিনের মতো—সেই রং-করা জ্যাকেট্‌ গায়ে, কোমর সরু দেখাবার জন্য সেই নীচু করে' ঘাগ্‌রা পরা। ওকে আবার দেখ্‌লাম, সেই দৃষ্টি, মুখ, কপালের নীচে দুটি বাঁকানো ভ্রূধনু, দুটি শিথিল সুকোমল হাত;—আমার মাথা ঘুরে' উঠ্‌ল। ভাব্‌লাম, একে আমি চুম্বন করেছি!

উঠে, দাঁড়ালাম।

"আমি এলেই তুমি দাঁড়াও। কেন? বোস, তোমার তোমার পায়ে লাগ্‌বে। কেন বন্দুক ছুঁড়েছিলে বল ত? আমি কিছুই জান্‌তাম না, সবে শুন্‌লাম। এতদিন কেবল ভেবেছি, গ্লাহনের কি হোল?—আর আসে না। সত্যিই কিছু জান্‌তাম না। প্রায় একমাসের ওপর তুমি ভুগছ, অথচ কেউ আমাকে কিছু বলে নি। কেমন আছ এখন? ভারি শুকিয়ে গেছ কিন্তু, চেনা যাচ্ছে না। তোমার পা,—তুমি খোঁড়া হয়ে যাবে নাকি? ডাক্তার বল্‌ছে, কিছু ভয় নেই, পা ঠিক থাকবে। সত্যি, যদি খোঁড়া না হও, কি সুখী যে হই, কত যে ভালোবাসি তোমাকে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। না বলে' হঠাৎ চলে' এলাম বলে' ক্ষমা করেছ আশা করি,—ছুটে আসছি ..."

আমার কাছে নুয়ে এল,—এত কাছে,—মুখের ওপর ওর নিশ্বাস পাচ্ছি। ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালাম। ও একটু সরে' গেল। ওর দুটি চোখ ভিজা।

বল্লাম,—'বন্দুকটা ঐ কোণে ছিল, বোকার মত এম্‌নি ধরে' ছিলাম, হঠাৎ গুলি ছুট্‌ল। হঠাৎ—"

মাথা নেড়ে ও বল্লে—"হঠাৎ। দেখি,—বাঁ পা,—ডান না হয়ে বাঁই বা কেন? হ্যাঁ, হঠাৎ—"

"সত্যিই হঠাৎ।" বল্লাম,—"কি করে' জান্‌ব বাঁ না ডান্‌? দেখ না, বন্দুকটা যদি এম্‌নি থাকে, তবে কোন পায়ে লাগে? ডান্‌? যা-তা কাণ্ড—"

অদ্ভুত ভাবে তাকায়। চারিদিকে চেয়ে বলে—"ভালো আছ তা হ'লে? খাবারের জন্য ঐ মেয়েটাকে কেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও নি? কি খাচ্ছ?"

আরো কতক্ষণ আলাপ হ'ল। বল্লাম,—"যখন তুমি এলে, তোমার সমস্ত মুখে চাঞ্চল্য, চোখে অপূর্ব্ব জ্যোতি, তুমি তোমার হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু তোমার চোখ আবার ম্লান হয়ে এসেছে। কিছু কি অপরাধ করেছি?"

স্তব্ধ।

"মানুষে সবসময়েই একরকম থাকতে পারে না ..."

বল্লাম,—"একটা কথা আমাকে বল। তোমাকে কী আঘাত দিলাম,—ভবিষ্যতে শোধ্‌রাতে পার্‌ব তা হ'লে—"

ও জান্‌লা দিয়ে দূর আকাশের দিকে চাইল, ব্যথিত স্বরে বল্লে—"কিছুই না গ্লাহ্‌ন্‌। শুধু শুধু মনে ভাবনা আসে। তুমি রাগ করেছ? কেউ অল্প দেয়,—কিন্তু তাদের পক্ষে সেটুকুন্‌ দেয়াই কত দুঃসাধ্য,—কেউ বা ঢেলে দেয়, একটুও যায় আসে না তাতে—এদের মধ্যে কে সত্যিই বেশি দেয়,—বল্‌তে পার? অসুখে তুমি ভারি মলিন হয়ে গেছ। আমরা কেন এ সব বাজে বক্‌ছি?" হঠাৎ আমার দিকে

চেয়ে বল্লে,—মুখ ওর খুসিতে রাঙা,—"শিগ্‌গিরই তুমি ভালো হয়ে যাবে। আবার দেখা হবে আমাদের।"

ও হাত বাড়িয়ে দিল।

কি যে মাথায় এল,—হাত নিলাম না। আমার হাত দুটো পেছনে রেখে উঠে দাঁড়ালাম,—নীচু হয়ে নমস্কার জানালাম,—দয়া করে' আমাকে যে দেখ্‌তে এসেছে তার জন্য ওকে ধন্যবাদ।

"তোমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে পার্‌লাম না, মাপ কোরো।"

ও চলে' গেলে চুপ করে' বসে' রইলাম বিছানায়। ইউনিফর্ম্মটা ফিরিয়ে দেবার জন্য চিঠি লিখ্‌লাম।

কুড়ি

বনে প্রথম দিন।

শ্রান্ত অথচ সুখী;—সমস্ত প্রাণী কাছে এসে মুখের দিকে তাকাচ্ছে, গাছের পোকা, পথের পোকা। সুপ্রভাত, তোমাদের সঙ্গে দেখা হোল! অরণ্য যেন আমার মধ্যে মর্ম্মরিত হচ্ছে, ওর প্রতি নিবিড় স্নেহ অনুভব কর্‌লাম,—আমি যেন আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় গলে' যাচ্ছি! বন্ধু অরণ্য, হৃদয় থেকে তোমার জন্য শুভকামনা কর্‌ছি, সুখী হও!

আমি, সমস্ত পথ ঘুরি ফিরি, সমস্ত কিছুর নাম ধরে' ডাকি, চোখ জলে ভরে' ওঠে। পাখী, গাছ, পাথর, ঘাস, পিঁপড়ে,—সবাইকে সম্বোধন করি। উঁচু পাহাড়ের দিকে তাকাই, ভাবি; ওরা যেন আমাকে ডাকে! 'এই যাচ্ছি—' কথা কয়ে' উঠি। ঐ বাজপাখীটার বাসা চিনি। পাহাড়ের উপরে ওদের শব্দ শুনে মন উড়ে' চলে।

দুপুরে নৌকো নিয়েএকটা ছোট দ্বীপে এসে ভিড়্‌লাম। আমার হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু, পেলব বৃন্ত,—বেগুনী রঙের ফুল—বুনো ঘাস ও কাঁটা গাছ ভিড় করে' আছে, ঠেলে চলেছি। একটা পশু নেই,—মানুষও না। পাহাড়ের নীচে সমুদ্র ধীরে ফেনায়িত হচ্ছে, দূরে পাহাড়ের উপর দলে দলে পাখীরা উড়ছে, চেঁচাচ্ছে। চতুর্দ্দিক থেকে সমুদ্র যেন আমাকে প্রিয়ার মত আলিঙ্গন করে' ধরেছে। ধন্য এই জীবন ও পৃথিবী ও আকাশ, ধন্য আমার শত্রু, ধন্য;—আমি এখন আমার নিদারুণ শত্রুকেও বিনীত সম্ভাষণ কর্‌তে পারি, তার জুতোর ফিতে বেঁধে দিতে পারি।

ম্যাকের নৌকো থেকে একটা শব্দ ভেসে এল,—পরিচিত গানের সুর, সমস্ত মন যেন রৌদ্র লেগে উল্লসিত হয়ে উঠল। দাঁড় বেয়ে চলে জেলেদের কুটীর পেরিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরি। দিন মরে' এসেছে, ঈশপের সঙ্গে একত্র খাওয়া সেরে আবার বনে বেরিয়েছি। আমার মুখে মৃদু বাতাসের স্পর্শ লাগ্‌ছে। আমার মুখ স্পর্শ করেছে বলে' বাতাসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, ওদের বলিও সে কথা, ধন্যবাদে আমার শিরায় রক্তধারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমার হাঁটুর ওপর ঈশপ ওর একটি থাবা তুলে দেয়।

ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘণ্টা বাজ্‌ছে। বহুদূরে সমুদ্রের মাঝে একটা পাহাড়। দুইবার প্রার্থনা করি, একবার আমার জন্য, আরেকবার কুকুরের,—পাহাড়ে যাই।

টকটকে লাল আকাশ,—আমার চোখের সুমুখে সূর্য্য, নমস্কার! রাত্রি যেন আলোকের সঙ্গে প্রতিধ্বনি করছে। আমি ও ঈশপ,—সব শান্ত, সুষুপ্ত। আমরা আর ঘুমুব না,—শিকারে বেরুব, কুকুরকে বলি,—আমাদের ওপরে লাল সূর্য্য হাস্‌ছে, ফিরে যাব না আর। ... মনে পাগল চিন্তার গাঁদি লাগে।

দুর্ব্বল,—মনে হ'ল কে যেন আমাকে চুম্বন কর্‌ছে, ঠোঁটে। বাঃ, কেউ নেই ত'। "ইসেলিন্!" ঘাসের ওপর অস্ফুট একটি শব্দ,—হয় ত একটি শুকনো পাতা খস্‌ল, হয় ত বা পদধ্বনি ক'র। বনের মধ্যে অপরূপ চাঞ্চল্য,—নিশ্চয়ই এ ইসেলিনের নিশ্বাস! এখেনেই ওর বাসা, এখেনে ও হলদে-জুতো-পরা নীল-কুর্ত্তি-গায়ে কত শিকারীর প্রার্থনা শুনেছে। চার পুরুষ আগে ও ওর জান্‌লায় বসে' বনে বনে শিঙা নাদের প্রতিধ্বনি শুন্‌ত। ছিল বল্‌গা হরিণ, নেকড়ে আর ভালুক,—অসংখ্য শিকারী। তারা সবাই দেখছে কেমন ক'রে ও ছোট্টটি থেকে ডাগর

হ'ল,—ওরা সবাই ওর জন্য প্রতীক্ষা করে' গেছে। কেউ কেউ দেখেছে ওর চোখ, কেউ শুনেছে ওর গলা,—কিন্তু এক রাতে এক বিনিদ্র গেঁয়ো শিকারী উঠে পড়ে' লুকিয়ে ওর ঘরে গিয়ে ওর কোমরের শাদা মখ্‌মলটি দেখে এল। যখন সবে ওর বারো বছর বয়েস, ডাগুাস্ এল। স্কচ্, জেলে, -দেদার্ জাহাজ ওর। ছেলে ছিল একটা। যখন ইসেলিন ষোল হো'ল, ছেলে ডাগুাসকে দেখলে। ঐ ওর প্রথম প্রেমিক...

এম্‌নি সব আজ্‌গুবি চিন্তা,—মাথা ভারী হয়ে আসে। চোখ বুজে ইসেলিনের চুম্বনের প্রতীক্ষা করি। ইসেলিন্, অন্তরঙ্গ, তুমি কি এখেনে? ডাইডেরিককে কি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছ? ... মাথা আরো ভারী হয়, ঘুমের তরঙ্গের ওপর ভাসি।

কে যেন কথা কইছে, যেন সপ্তর্ষি আমার রক্তের ছন্দে গান গাইছে।—ইসেলিনের গলা—

'ঘুমোও। ঘুমোও। আমি আমার প্রথম প্রেমের গল্প বলি, প্রথম রাত্রির। মনে আছে, দরজা বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে ভুলে গেছ্‌লাম আমার ষোলো বয়েস, তখন বসন্তের বেলা, মিঠা বাতাস। ডাগুাস্ এল, ঈগলের পাখার ঝাপটের মত। শিকারে বেরুবার আগে ওর সঙ্গে একদিন মোটে দেখা হয়েছিল, পঁচিশ ওর বয়েস, অনেক দূর থেকে এসেছে। বাগানে আমার পাশে পাশেই হাঁট্‌ল, আর যেম্‌নি আমাকে ছুঁ'ল, ভালবাস্‌লাম। কপালে ওর ছুটি লাল দাগ, ইচ্ছে হোল ঐ ছুটো দাগের ওপর চুমু দিই।

"শিকারের পর বিকেলে ওকে বাগানে খুঁজ্‌তে বেরুলাম,—যদি ওকে না পাই, ভারি ভয় করছিল। আপন মনে ওর নামটা আস্তে একটু আওড়ালাম, ও যেন না শোনে! ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ও বল্লে—'মাঝ রাতের এক ঘণ্টা বাদে।'"

'চলে' গেল।

"এক ঘণ্টা বাদে মাঝ রাতের", নিজের মনে বল্লাম,—"কি তার মানে? জানি না। হয় ত ও দূর দেশে চলে' যাচ্ছে, হয় ত মাঝ রাতের এক ঘণ্টা বাদেই, কিন্তু আমার তাতে কি?"

"তারপর,—আমার দরজা বন্ধ করে' রাখ্‌তে হঠাৎ ভুল হোল ..."

"মাঝরাতের একঘণ্টা বাদে ও আসে।"

"দোর কি বন্ধ ছিল না?" শুধোই।

"এখন বন্ধ করে' দিচ্ছি।" ও বলে।

"দরজা বন্ধ করে' দেয়। শুধু আমরা।

"কি বিশ্রী ওর ভারী বুটের শব্দ! 'আমার ঝিকে জাগিয়ে দিয়ো না।' বলি। চেয়ারটা পর্য্যন্ত নড়্‌বড়ে, বস্‌লেই আওয়াজ হয়। না না ঐ চেয়ারটায় বসো না, ভাঙা।'

" 'তোমার পাশে বসি তা হ'লে?

" 'বসো।' বলি।

"শুধু ঐ চেয়ারটা ভ'ঙা বলে'—

"সোফায় আমরা দুজনে ব'সে,—আমি উঠে গেলাম, ওও উঠল।

" 'ঠাণ্ডা গা তোমার।' আমার হাত ধরে' ও বল্লে। 'তুমি সত্যিই কি কাঁপিয়ে গেছ!' আমাকে ঘিরে ওর বাহু।

"ওর বাহুবন্ধনে তপ্ত হয়ে উঠ্‌লাম। তাই আরো একটু বস্‌লাম দুজনে। একটা মোরগ ডেকে উঠল।

" 'শুন্‌লে, মোরগ ডাকছে?' ও বল্লে,—'ভোর হয়ে এল।'

"আমাকে ও ছুঁ'ল! হারিয়ে গেলাম।

" 'সত্যিই কি মোরগ ডাকছে?' ঢোক গিলে বল্লাম।

"ওর কপালে সেই দুটি জ্বরে পোড়া লাল দাগ,—উঠ্‌তে চাইল'ম। দিল না উঠ্‌তে, ধ'রে রইল। সেই দুটি মিষ্টি দাগে চুমু দিলাম,—ওর সাম্‌নে চোখ বুজে আছি।

"ভোর হয়ে গেল। উঠ্‌লাম,—সব অচেনা, এ যেন আমার ঘরের দেয়াল নয়, নিজের জুতো যেন চিন্‌তে পারছি না,—একটা আকুল শিহরণে যেন সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। কি এ? হাসি পেল। ক'টা এখন? জানি না,—শুধু মনে আছে দোরে খিল দিতে ভুলে গেছ্‌লাম।

"ঝি আসে।

" 'ফুল গাছে এখনো জল দেওয়া হয় নি।' বলে।

"ফুলের কথা ভুলে গেছি।

" 'তোমার পোষাক কুঁচকে গেছে—' ও বলে।

"হাসি পেল। গত রাত্রে বোধ হয়।

"দরজার কাছে একটা গাড়ী আসে।

" 'বিড়ালটার জন্য দুধ নেই।' ও বলে।

"ফুলের কথা ভাবি না, না পোষাক, না বিড়ালের।

"শুধোই, 'ডাগুাস্ এল কি না দেখ্ ত। ওকে আস্তে বল্, ওর জন্য বসে' আছি।' ... ভাবি, এসে আজো কি দোর বন্ধ করে' দেবে?

"দরজায় কে টোকা দেয়। খুলে দরজাটা নিজেই বন্ধ করি, ওরই বরং একটু সাহায্য করা হোল।

" 'ইসেলিন্।' ও ডাকে। পুরো এক মিনিট ধরে ঠোঁটে চুমু দেয়।

" 'তোমাক ডেকে পাঠাই নি।' কানে কানে বলি।

" 'পাঠাও নি?'

ব্যথা পাই যেন, বলি, 'না, পাঠিয়েছিলাম। তোমার জন্য এত অপেক্ষা করছিলাম। একটু থাক।'

"ওরই জন্য চোখ ঢেকে রইলাম। ও আমাকে ছেড়ে দিল না, ওর কাছে স'রে এসে লুকিয়ে আছি।

" 'মোরগ ডাকছে।' ও বলে।

" 'না, কোথায় মোরগ?'

"ও আমার বুক চুম্বন করলে।

" 'দাঁড়াও, দোর বন্ধ করে' দিয়ে আসি।' ও উঠ্‌তে চাইল।

"উঠ্‌তে দিলাম না। বল্লাম কানে কানে,—'দরজা বন্ধ।

"আবার সন্ধ্যা,—চলে' গেল ডাগুাস্। আয়নার সাম্‌নে দাঁড়ালাম, দুটি প্রেমোজ্জ্বল চক্ষু আমাকে সম্ভাষণ করছে—সমস্ত হৃদয় দুলে' কেঁপে শিউরে উঠ্‌ছে। আমার চোখ যে এত সুন্দর তা তো জানি নি আগে, নিজের ঠোঁটের ওপর চুমু দিলাম—আয়নায়।

"এই আমার প্রথম রাত্রি,—প্রভাত ও সন্ধ্যা। আরেক সময় তোমাকে ভেগু হাল্‌ফ্‌সেন্-এর গল্প করব। ওকেও ভালবাস্‌তাম, ঐ দূরে, দ্বীপে ও থাকত,—এখান থেকে দেখা যায়,—কতদিন বিকেলে নৌকা বেয়ে ঐ পারে গেছি, ওর কাছে। ষ্টেমার-এর গল্পও বলব তোমাকে। ছিল পুরুত, কিন্তু ভালোবাসতাম। সবাইকেই ভালবাসি ..."

আধঘুমের মধ্যে মোরগের ডাক শুনি—নীচে, সিরিল্যাণ্ড-এ।

"শোন ইসেলিন! আমাদের জন্যও মোরগ ডাকছে—" সুখে চেঁচিয়ে উঠি, দুই হাত বাড়িয়ে দিই। জাগি। ঈশপও নড়ে' উঠেছে। চলে' গেল —দারুণ বেদনায় বলে' ফেলি, চারপাশে তাকাই। কেউ নেই,—ফাঁকা। ভোর হয়ে গেছে, নীচে সিরিল্যাণ্ড-এ এখনো মোরগ ডাকছে।

কুঁড়ের ধারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে,—এভা। হাতে একটা দড়ি, কাঠ আন্‌তে যাচ্ছে। মেয়েটির জীবনের এই ভোর বেলা, তরুণ ওর দেহ,—নিঃশ্বাসে ওর বুক দুলছে, রোদ এসে পড়েছে।

"তুমি ভেবো না ...' কথা শেষ করতে পারে না।

"কি ভাব্‌ব না এভা?"

"যে, তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এ পথে এসেছি। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম—"

লজ্জায় ওর মুখ ঈষৎ রাঙা হয়ে ওঠে।

—ক্রমশ

দীপক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

১২

দীপক প্রতিজ্ঞা করিল বটে কিন্তু পথ পাইল না।

নয়নতারা একদিন ডাকিয়া বলিলেন, দীপক, আমি ভাব্‌ছিলাম শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে আমরা থাকি। একটু ফাঁকা জায়গাও হবে আর বাড়ীভাড়াও অনেক কম লাগ্‌বে।

দীপক উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শোভনা বলিল, হ্যাঁ মা, তাহলে বড়দার ছেলেপিলেরাও একটু খেলতে বেড়াতে পায়। এ যে একেবারে খাঁচার বাসা—চল্‌তে গেলে সিঁড়ি, ছুটতে গেলে দেয়াল! একটু ফাঁকা জায়গায় গেলে ওরা তবু বাঁচবে।

দীপক এতক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিল। শোভনার কথা শেষ হইলে বলিল, ফাঁকা জায়গায় যেতে চাও, আমার কোনও আপত্তি নেই মা, কিন্তু তোমার ইচ্ছার মূলে আসল যে কথাটি সেইটেই আমাকে লজ্জা দিচ্ছে।

নয়নতারা নিমেষে ছেলের মনের ব্যথা বুঝিলেন। তিনি বেশ দৃঢ়স্বরেই বলিলেন, দীপক, লজ্জার কথা তুমি যা' বলছ আমি তা মোটেই ভাবি নি। তোমার যে মনের কামনা আমি তাকে শ্রদ্ধা করি বলেই সংসারের অনাবশ্যক খরচগুলি কমাতে আমার একটুও বাধে নি। তুমি আর অজয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে যা' আন্‌ছ তাতে দুঃখ করবার মত কিছু নেই। কিন্তু ভাবনা আমার অন্য দিকে। ভাবনা তোমার জন্য। তোমার এই বিশ্বাস, তোমার এই সরলতার জন্য হয় ত তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে। লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে এবং সেইজন্যই হয় ত তোমাকে অনেক আঘাত সহ্য করতে হবে। ভাব্‌ছি আমি তাই।

মায়ের কথা শুনিয়া দীপক মুগ্ধ হইল। ধীরে ধীরে বলিল, আজকের মত সৌভাগ্য আমার কোনও দিন হবে না মা! তুমি আমার সহায়, তুমি আমার মাথার ওপর, আমার আর ভাবনা কি? তোমার পায়ের তলায় বসে আমার জীবন সফল হয়ে উঠবে। বাইরের ভুল বোঝাকে আমি ভয় করি না। আঘাত যত বড়ই হোক্, তা যদি মিথ্যা হয়, তোমার আশীর্ব্বাদে তা উপেক্ষা করবার মত আমার শক্তি আছে। মা, শুধু তুমি আমায় ভুল বুঝো না তাহলেই আমার পরম শান্তি। আর যদি ভুল করিই তাহলে তা' বুঝিয়ে দিয়ো।

নয়নতারা পুত্রের মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, শুধু এইটুকু মনে রেখো বাবা, যেন কোনও কাজে তোমার বংশের বা পরিবারের অগৌরব না হয়। উপার্জ্জন সকলেই করে, কিন্তু শুধু উপার্জ্জনের জন্য ছেলের মুখ চেয়ে থাকব এমন মা আমি হতে চাই না।

দীপকের চোখে জল আসিল। সে মস্তক লুটাইয়া মায়ের চরণধূলি লইল। দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি জানি না মা, আমার আশা আকাঙ্ক্ষার কোথায় শেষ হবে; কিন্তু আমার মন ভরে যে নানা আশা আকুল হয়ে ওঠে, আমার ইচ্ছা করে আমার এমন শক্তি হোক্ আমি সব আশাগুলিকে মুক্তি দিতে পারি। মনে হয়, মানুষ মানুষকে যে দুঃখ দেয় সে দুঃখ যেন আমি বিধাতার বর পেয়ে সব দূর ক'রে দিতে পারি। এ কি খুব বেশী আশা মা?

নয়নতারার মুখখানা দেবীপ্রতিমার মত পবিত্র দেখাইতেছিল। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, না দীপক, মানুষের পক্ষে এ খুব বড় আশা নয়। কিন্তু যতখানি শক্তি, যতখানি সাহস, ধৈর্য্য মানুষের জীবনে প্রয়োজন খুব কম মানুষেরই ততখানি থাকে। মানুষের দুঃখে ব্যথিত হয়ে শ্রীবুদ্ধ ত্যাগী হয়েছিলেন, বহু মহাজন মানুষের দুঃখের দহনে নিজেদের আহুতি দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু পারেন নি দুঃখের শেষ করতে।

দীপক চিন্তিতমনে বলিল, মা, বেশী কিছু বুঝি না। চোখে যখন দেখি মানুষ মানুষকে দুঃখ দিচ্ছে তখন আমার মনে যে দুঃখ হয় সেইটেই আমার কাছে বড় জিনিষ। তাই মন বলে, মানুষকে দুঃখ দেওয়ার মানুষের অধিকার নেই।

নয়নতারা সস্নেহে বলিলেন, দুঃখীও একটা ছুটো নয়, দুঃখও একটা ছুটো নয়। কিন্তু পরের দুঃখ মাথায় করে নেয় তেমন লোক খুবই কম। তোমার যা মনে হয়েছে করে যাও। নিজের মনের সম্পূর্ণ সায় যদি পাও, কোনও ক্ষতি হবে না কোনও দিন। কিন্তু নিজেকে কখন ফাঁকি দিও না।

কথা সেখানেই শেষ হইল। নয়নতারা চলিয়া গেলেন। দীপক বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল, শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, একটা কথা বল্‌বে দীপক? তুমি যে রোজ রাস্তাঘাটে এত ঘুরে বেড়াও তাকে কি কোনও দিন দেখ্‌তে পাও?

দীপক অন্যমনস্কভাবে বলিল, কাকে?

শোভনা অতি কষ্টে যেন উচ্চারণ করিল, কল্যাণকে।

দীপক শোভনার দিকে ফিরিয়া চাহিল। শোভনার চোখ জলে ছল ছল। দীপক তাহা দেখিয়া ব্যথিত হইল। নম্রস্বরে বলিল, দেখা হয়—প্রায় রোজ। আমার সঙ্গে তার চেনা হয়ে গেছে। সেই ত আমার সাথী।

শোভনা যেন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, দেখা হয়—দেখা হয়? রোজ? সে তোমার সাথী!—সে কি বলে তোমাকে?

দীপক বলিতে লাগিল, বলে অনেক কথা। সে যে যুদ্ধে গিয়েছিল তারই কথা গল্প করে। কত দেশ ঘুরেছে, কত বিপদে পড়েছে, কত কি দেখেছে তাই বলে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু বলে না?

দীপক বলিল, বলে, আমাদের কথা বলে, তার বাবার কথা, ঠাকুরদার কথা বলে, আর—

শোভনা যেন অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল, আর—আর কি বলে?

দীপক স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে বলিল, আর বলে তোমার কথা—তার মায়ের কথা। তার মায়ের অভিশপ্ত জীবনের কথা, তার মায়ের কাছে তার বাবার অপরাধের ঋণের কথা।

শোভনা যেন পাগল হইয়া গেল। মাথা দোলাইয়া মৃদুস্বরে কেবলই বলিতে লাগিল, বলে—তার মায়ের কথা—তার মায়ের কথা!

দীপক শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে নারীর এই পবিত্র রূপটি প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল নারীর এই মহীয়সীরূপ সকল রূপ ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে, যেন রুগ্ন কাহাকেও স্পর্শ করিতেছে এমনি সন্তর্পণে দীপক শোভনার হাতখানি নিজের মুঠার মধ্যে লইয়া বলিল, দিদি, সে একদিন আস্‌তে চায়।

শোভনার দৃষ্টি তখন শূন্যগৃহের কোন্ গভীরে যেন নামিয়া গিয়াছে, মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-উদ্ভাসিত শ্রী, চক্ষে বিমল বারিবিন্দু, ওষ্ঠে মৃদু হাসি—আর মুখে সাড়া নাই—যেন ধ্যান নিমগ্না তপস্বিনী।

শোভনা কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া দীপক আবার বলিল, সে একদিন তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌তে চায়, আস্‌তে বল্‌ব কি?

শোভনা সে কথারও কোন উত্তর করিল না। স্নেহসিক্ত স্পর্শে দীপকের মাথাটি টানিয়া লইয়া কপালে চুম্বন করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, এত কাল পরে মাকে মনে পড়ল? ওরে অভাগা, আমারই কি সব দোষ?

দীপক বুঝিল, শোভনা কল্পনার চক্ষে পুত্রকেই যেন উপস্থিত দেখিতেছিল। সে আর মাথা সরাইল না। শুধু

ধীরে শোভনার হাতখানি লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, তোমার কোনও দোষ নেই, আমি জানি তোমার কোনও দোষ নেই।

শোভনা তারই উত্তরে যেন অতি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, না নেই নেই—সবাই জানত শোভনার দোষ নেই।

বলিতে বলিতে কেমন যেন ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিল। দীপক তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শহরেরই উপকণ্ঠে একখানি চালাঘর ভাড়া করা হইয়াছে। মাটির দেয়াল, খড়ের ছাউনি। আশে পাশে একটু খালি জমীও আছে। নয়নতারা সকলকে লইয়া আবার এখানে আসিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিয়াছেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটু ছুটাছুটি করিবার জায়গা পাইয়াছে। নয়নতারা, বউ-মা ও শোভনাকে লইয়া ভিতর-বাড়ীতে শাক-সবজীর ক্ষেত করিয়াছেন। অজয় পাশ করিয়া চাকরীর সন্ধানে ঘুরিতেছে। ফিরিবার সময় টিউশনি করিয়া রাত্রে বাড়ী ফেরে। দীপক দ্বিগুণ পরিশ্রম করিয়া এখানে সেখানে উপার্জ্জন করিয়া যাহা আনে তাহা আগের অপেক্ষা ভালই বলিতে হয়।

এমনি করিয়া দিন যায়। বর্ষা আসিয়া পড়িল। চাল দিয়া জল ঝরে। অজয় বলে চাকরীটা পাইলে একটা ভাল বাড়ীতে যাইব। নয়নতারা বুঝাইয়া বলেন, এই বাড়ীই ত বেশ। বাড়ীওয়ালা সারিয়ে না দেয়, আমরাই খরচ করে না হয় সারিয়ে নেব। থাকতে ত হবে।

কিন্তু ঘর সারাইবার ব্যবস্থা হইতে হইতে নয়নতারা শয্যা লইলেন। সর্দ্দি কাশি জর।

অজয় চাকরী পাইয়াছে—মাহিনাও মন্দ নয়। দুই ভাইকেই কাজে যাইতে হয়। কল্যাণ দিন রাত্রি থাকে, অক্লান্ত ভাবে রোগীর সেবা ও পরিচর্য্যা করে। শোভনা ও বিমলা সংসার চালায়, রোগীর শুশ্রূষা করে।

সুখের দিন যখন একটু আসিল তখন এই বিপদ। নয়নতারার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে চলিল।

নূতন চাকরী, অজয় ছুটি লইতে পারে না। দীপক একদিন বাহিরে না গেলেও টাকা আসে না। এখন খরচ অনেক। মন না মানিলেও দুজনকেই কাজে যাইতে হয়।

প্রসাদ বলিয়া বাড়ীর পিছনের একটি গৃহস্থও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। প্রসাদ চাষবাস করিয়া ফল পাবড়া বেচিয়া খায়। সকালের হাট শেষ করিয়া শেষবেলায় সে বাড়ী ফেরে। কোনও মতে দুটি নাকে মুখে গুঁজিয়া সেই যে সে নয়নতারার দোরের কাছে মাটি লইয়া বসে আর সেই গভীর রাত্রে সকলে ঠেলাঠেলি না করিলে বাড়ী যায় না। প্রসাদেরও স্ত্রী চিররুগ্না—মেয়েটি বড় হইয়াছে কিন্তু বিবাহ দেওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই।

মাকে জল-পথ্য দিয়া প্রায় সারাটি দিন মালাও নয়নতারার বিছানার পাশে বসিয়া থাকে। কখনও কখনও বিমলার হাত হইতে দুখানা বাসনও বা কাড়িয়া লইয়া মাজিয়া দেয়। বলে, তোমাদের কষ্ট হয় বৌদি। আমাদের চিরকালের অভ্যেস —দাও আমাকে। শোভনা কাপড় কাচিতে গেলে, কাপড়গুলি টানিয়া লইয়া বলে, দাও দিদি, আমি কেচে দি, তুমি গিয়ে ততক্ষণ মা'র কাছে বোস গে।

নয়নতারার যেমন দিন দিন রোগ বাড়িতে লাগিল দীপকের আয়ও তেমনি যেন পরশমণির স্পর্শে বাড়িয়া চলিল। যে কাজ গুছাইয়া তুলিবার জন্য পূর্ব্বে তাহাকে দশদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে আজ সেই কাজ অতি সহজেই হইয়া যায়। বাজারে মাল বেচা-কেনা করাই এখন তার কাজ। পারিশ্রমিক হিসাবে ক্রেতা বা বিক্রেতার কাছে যাহা পায় তাহা খুব সামান্য নহে। কিন্তু সারাদিন রাত্রি মায়ের অসুখের জন্য যে দুশ্চিন্তা তাহাকে ঘেরিয়া থাকে, এত অর্থের সহজ সমাগমেও তাহার একটুও উপশম হয় না।

দুইমাস কাটিয়া গেল, নয়নতারার এদিক ওদিক কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

একদিন ছেলেরা বাড়ী ফিরিলে নয়নতারা সকলকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। দুই ছেলেকেই বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা মৃত্যুর পূর্ব্বে ছেলেরা সংসারী হইয়াছে দেখিয়া যান্।

দীপক বলিল, তুমিই যদি সংসারে না রইলে তাহলে সংসার কিসের? বউ এলে কার কাছে তারা শিক্ষা দীক্ষা পাবে?

নয়নতারা বুঝিলেন, লোহা হইলে গলিত কিন্তু এ মাটি, পুড়িয়া লাল হইয়া যাইবে কিন্তু গলিবে না। কাজেই অজয়কেই একটু বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। অজয় সেদিন আর কোনও কথা বলিল না কিন্তু কয়েকদিন অনুরোধ উপরোধের পর তাহার মন আর সম্মতি না দিয়া পারিল না। মা'র মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার একটা অনুরোধ রক্ষা করিয়া যদি তাঁহাকে একটুও শান্তি দেওয়া যায়, এই ভাবিয়া সে একদিন মায়ের পায়ে হাত দিয়া বিবাহে সম্মতি দিল।

নয়নতারা খুশী হইয়া দীপক ও আর সকলকে ডাকিয়া সে কথা জানাইলেন।

একমাসের মধ্যেই অজয়ের বিবাহ হইয়া গেল। নূতন বউ আসিয়া শাশুড়ীর সেবায় লাগিয়া গেল। নয়নতারার কত সুখ!

মা দীপককে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ, আমার কেমন লক্ষ্মী-বউ। তোমার বউটিও যদি দেখে যেতে পারতাম, তবু মনে একটু শান্তি পেতাম তোমাকে দেখ্‌বার শোনবার কেউ রইল। কিন্তু তা নইলে তোমার যে কি দশা হবে!

দীপক মায়ের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, মা, তুমি ভাল হয়ে ওঠ, আমি নিশ্চয় বিয়ে করব।

নয়নতারা দীপকের বুকে তাঁহার শীর্ণ শীতল হাতখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তবে আর হোল না। কিন্তু কে তোকে দেখ্‌বে, কে তোর ব্যথা বুঝ্‌বে। আমি যে তাকে তৈরী করে দিয়ে যেতাম। তোকে চেন্‌বার মত তাকে প্রস্তুত করে দিতাম। এর পরে যে তুই শূন্য ঘরে ছট্‌ফট্‌ করে মরবি আর শূন্য পথে নিঃশ্বাস ফেলে একটা সঙ্গীর জন্য হাত্‌ড়ে বেড়াবি তখন তোকে কে দেখ্‌বে!

দীপক হাসিয়া বলিল, মা, আমার দুঃখ যতখানি নয় তোমার ভাবনা তার চাইতে বেশী। শূন্য যদি লাগেই কোনও দিন, কি করব আর, ঐ শূন্যতার মধ্যেই কিছু নিশ্চয় পাব যা ধরে থেকে মরার দিনও বেঁচে যাব।

মাতাপুত্রে এত কথা হইল কিন্তু কোনও মীমাংসাই হইল না। মায়ের মনে আশা, হয় ত এখনও দীপক বিবাহে মত দিতে পারে। এমনি আশার তারে দক্ষিণের বাতাস আসিয়া নূতন আশার টঙ্কার দিয়া গেল। নয়নতারা ভাবিলেন, তাহ'লে—আরও কয়েকটা দিন যদি বাঁচিয়া যাইতে পারেন।

এই নূতন আশা আর কিছুই নয়। নূতন-বউ সুষমার এক বন্ধু প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসে। মেয়েটি দেখিতেও ভাল, স্বভাবও মিষ্টি। কয়েকদিন আসিয়াই বাড়ীর সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। নয়নতারা ত একেবারে পুষ্প বলিতে অজ্ঞান। আশার কথা আরও এই, পুষ্প মেয়েটির বিবাহ হয় নাই, এবং দীপকও এই মেয়েটির সঙ্গে বেশ আলাপ জমাইয়া তুলিয়াছে। মায়ের প্রাণের আশা, যদি মেয়েটিকে ভাল লাগিয়া যায়, যদি দীপক বিবাহ করিতে রাজী হয়; আরও আশার কথা, পুষ্পদের ঘর ভাল, সম্বন্ধ হইতে কোনই বাধা নাই।

মৃত্যুপথযাত্রী তখনও এই একটা শেষ আশার মোহে নিজের রোগযন্ত্রণার কথা প্রায় ভুলিয়া থাকিতেন। কিন্তু শেষে এমন একদিন আসিল, নয়নতারার জীবনের আশা আর নাই। সারাদিন ডাক্তার, ঔষধপত্র ক্ষণে ক্ষণে রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে করিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। দীপক মায়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল। অজয় বারান্দায় দাঁড়াইয়া লুকাইয়া অশ্রু-মোচন করিতেছিল। নূতন বউ সুষমা নয়নতারার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। পুষ্প সেই আগের দিন এ বাড়ীতে আসিয়াছে আর বাড়ী যায় নাই। সেও নয়ন-তারার শয্যা প্রান্তে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। প্রসাদের মেয়ে মালা ছেলেদের খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতেছিল।

নয়নতারা চক্ষু মেলিলেন। অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তুমি যাবে না দীপক?

দীপকের মনেও সে ভাবনাটা ছিল। এত হাজার হাজার লোক আসিবে—টিকেট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাহারই প্রধান অংশ অভিনয় করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে

দুইরাত্রি অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আজ শেষ রাত্রি। এই কয় রাত্রি অভিনয় দেখিয়া লোকেরা খুব সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটা স্কুল-বাড়ী তুলিবার জন্য অভিনয় করিয়া টাকা তুলিবার আয়োজন হইয়াছিল। গত দুইরাত্রি অভিনয়ে যে টাকা উঠিয়াছে তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। আজ রাত্রিটা হইয়া গেলেই হয়। দীপক তাই ভাবিতেছিল সে কি করিবে। আর মাত্র ঘণ্টা দুই বাকী। প্রধান ভূমিকা তাহারই। আজ সে না গেলে এত হঠাৎ কেই বা তাহার অংশ অভিনয় করে! অথচ অভিনয় বন্ধ করার এখন আর কোনও উপায় নাই। তাই মা'র মুখে যখন তার মনেরই কথা শুনিল তখন আর কি বলিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

নয়নতারা ছেলেকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নিজে হইতেই বলিলেন, তোমাকে যেতেই হবে। এত বড় একটা আয়োজন তা নইলে একেবারে পণ্ড হয়ে যাবে।

দীপক বলিল, দেখি, যাব না বলেই ত ভাবছিলাম। তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

নয়নতারার ম্লানমুখে একটু সকরুণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি না ফেরা পর্য্যন্ত আমি মরব না। তোমার সময় বোধ হয় হয়ে গেছে, এখনি যাও।

দীপক নিতান্ত অনিচ্ছায় অশ্রুসিক্ত চোখে মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইল। পথে ভাড়া-মোটরে বসিয়া ভাবিতেছিল, যদি ফিরিয়া আর মাকে না দেখিতে পায়।

দীপক যাইতেই সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। দীপকের মায়ের অবস্থা শুনিয়া সকলেই প্রায় তার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাই নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই অন্য একজনকে ধরিয়া দীপকের ভূমিকাটি অভ্যাস করাইতেছিল।

যাহাহউক, অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল। দীপকের মন দুঃখে দুশ্চিন্তায় ভারি হইয়া ছিল। কিন্তু অভিনয়ে ত্রুটি হইলে চলিবে না। সমস্ত প্রাণকে যেন চাপিয়া রাখিয়াই দীপক অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিল। নাটকের শেষ অংশে দীপক যে অভিনয় করিল তাহা সমস্ত দর্শককে অভিভূত করিয়া দিল। সভামধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। কানে কানে জানাজানি হইয়া গেল, দীপকের মায়ের শেষ অবস্থা! আর একটি মাত্র দৃশ্য বাকী—দীপকের মন আর স্থির থাকে না। বেদনায়, উৎকণ্ঠায় তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শেষ দৃশ্যে যখন সে মঞ্চদৃশ্যে প্রবেশ করিতে যাইবে তখন তাহার বাড়ী হইতে প্রসাদ আসিয়া সংবাদ দিল নয়নতারার অবস্থা এখন-তখন।

ঢুকিতে যাইয়াও দীপক সংবাদটা শুনিয়া এক-পা পিছাইয়া আসিল। চোখ ফাটিয়া তখন অশ্রুর বন্যা ছুটিয়াছে—বুকে যেন পাথর চাপিয়া বসিয়াছে। শুধু একবার চোখ বুজিয়া কি যেন নিবেদন করিল, তাহার পরই চোখ মুছিয়া একেবারে মঞ্চে প্রবেশ করিল।

নাটকে ছিল, রাজার ছেলে অনেক কষ্ট, অনেক সংগ্রামের পর সিংহাসন পাইয়াছে—তাই নর্ত্তকীরা গীতবাদ্য দ্বারা সভাজনকে আনন্দ দিতেছে; রাজকুমার সভায় বসিয়া প্রজা ও অমাত্যদের হাত হইতে মুকুট ও রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন।

গীতবাদ্য, নাচ চলিয়াছে। সভাস্থল আলো, ফুল ও বিবিধ সজ্জায় উজ্জ্বল। সমবেত বহু অমাত্য, বণিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত। দীপক সহাস্যে সকলের নিকট মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি গ্রহণ করিল।

কিন্তু আর চোখের জল থাকে না। নিরুদ্ধ বক্ষের আবেগ ও যাতনা তাহাকে পিষিয়া মারিতেছিল, তবু হাসি মুখে এতটা সে অভিনয় করিয়া আসিয়াছে। আর স্থির থাকা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

দীপক ধীরে ধীরে সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া সাশ্রু নয়নে পূর্ণ আবেগে সভাস্থ সকলের নিকট যে নিবেদন করিল তাহাতে শ্রোতাদের মধ্যেও অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল।

দীপক বলিল, অমাত্য, পণ্ডিত ও সমবেত সজ্জনগণ, আজ এই শুভক্ষণে এত আনন্দের মধ্যেও আমাকে সভাস্থল ত্যাগ করিতে হইতেছে। আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। আজ আমার অভিষেক কিন্তু জননী অত্যন্ত পীড়িতা। হয় ত আমি তাঁহাকে যাইয়া

আর দেখিতে পাইব না। আপনারা আনন্দ করুন, আমাকে যাইবার অনুমতি দান করুন।

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া অনুমতি দিবার পূর্ব্বেই দীপক দৃশ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। নিমেষ মাত্র বিলম্ব না করিয়া মোটরে করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। দর্শকগণ মনে করিলেন দীপক যাহা বলিয়া গেল তাহা অভিনয়েরই অংশ। প্রেক্ষাগৃহ দীপকের অভিনয়ে ধন্য ধন্য শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। সুধীবর্গ পুষ্প স্তবক ও প্রশংসাবাক্য নিবেদন করিতে আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

দীপক যখন গিয়া মায়ের মুখের সামনে দাঁড়াইল তখন নয়নতারার শ্বাস দীর্ঘ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মুখে কি প্রশান্ত ধৈর্য্যের প্রভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠেই দীপক ডাকিল, মা!

নয়নতারা চক্ষু মেলিলেন, একটু মৃদু হাসিয়া হাতখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া দীপকের মাথায় রাখিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

গৃহ ভরিয়া কান্নার রোল উঠিল। দীপক ধীরে ধীরে হাতখানি নামাইয়া মায়ের বুকের উপর রাখিয়া দিল। তারপর সমস্ত জানালা দরজাগুলি খুলিয়া দিয়া মায়ের মুখের দিকে আবিষ্টের মত একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

—ক্রমশ

শিল্পী দেবীপ্রসাদ

আমরা প্রায় প্রতিমাসেই কোনও বিশিষ্ট লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী—এমনি কাহারও ছবি দিয়ে থাকি। এবারে ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছবি দেওয়া হোল। বাঙলা দেশের অনেকেই এই তরুণ শিল্পীর চিত্রশিল্পের পরিচয় পেয়েছেন। কল্লোলেও বার কয়েক ওঁর আঁকা ছবি বেরিয়েছে।

বয়স মাত্র আটাস বছর, কিন্তু এরই মধ্যে নিজ দেশে এবং বিদেশে ইনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছেন।

ইনি প্রথমে ছবি আঁকা শিক্ষা আরম্ভ করেন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে। তখন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে ইনি চিত্রবিদ্যা লাভ করেন। পরে অবনীন্দ্রনাথের উপদেশ মতেই ইতালীয় ভাস্কর ও চিত্রী বয়েজ্ (Mr. Boyes) সাহেবের কাছে realistic painting শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিছুকাল শিক্ষার পর সাহেব স্থানান্তরে চলিয়া গেলে প্রসিদ্ধ বাঙালী-ভাস্কর শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়চৌধুরী এ, আর, সি, এ মহাশয়ের কাছে ভাস্কর্য্য বিদ্যা শিক্ষা করেন।

শৈশব থেকেই এঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে নজর ছিল। সাধারণের একটা ধারণা আছে—চিত্রশিল্পী হলেই তার লম্বা লম্বা চুল হবে, ক্ষীণ দেহযষ্ঠী ও উদ্‌ভ্রান্ত ভাব হবে। দেবীপ্রসাদ সে ধারণা ভুল বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করেন। বাঙলা ডন্ কুস্তী তিনি অনেকদিন থেকে করে আস্‌ছেন। তাঁর বিশ্বাস শরীরে তেজ্ না থাক্‌লে মানুষের মনের তেজ থাকে কম। এবং মনের তেজের প্রফুল্লতায় যে সকল কল্পনা শিল্পীর মনে আসে তা অসার পরিকল্পনা হয় না। ভাস্কর্য্য বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়, নিজ দেহের মাংশপেশী সকল নিখুঁত ভাবে চিন্‌তে না পারলে শিল্পীর পক্ষে অনেক অসুবিধা হয়। আমাদের দেশে যে সকল মডেল পাওয়া যায় তার শরীর সব দিক দিয়ে শিল্পীর অঙ্কন কার্য্যের পক্ষে সহায়তা করে না।

দেবীপ্রসাদ যখন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে থাক্‌তে কুস্তী শেষ করে একটা বাঁশের বাঁশী বাজাতে বাজাতে বাড়ী ফেরেন তখন পাড়ার লোক অনেকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে

চিন্‌তে পারে—দেবীপ্রসাদ কুস্তী লড়ে' বাড়ী ফিরছে। কিন্তু কুস্তী করলেও তাঁর দেহ কুস্তীগিরদের মত কঠিন ও অসাধারণ পেশীবহুল নয়। সাধারণ মানুষের মতই কোমল অথচ স্বাস্থ্যবান। দেবীপ্রসাদ বাঁশের বাঁশী খুব সুন্দর বাজাতে পারেন। গানের দিকেও তাঁর ঝোঁক যথেষ্ট। গলা সেধে কিছুকাল গানেরও চর্চ্চা করেছিলেন। তারপর সময় ও সুযোগের অভাবে গান বা বাজনার দিকে আর বেশী মন দিতে পারেন নি। দেবীপ্রসাদ লোকটি সোজাসুজি লোক। খাতির করে বা লোক দেখাবার জন্য তিনি কখনো কোনো বাজে ব্যবহার করেন না। তাঁর ছবি আঁকবার ঘরটি দেখ্‌লে হয় ত সংসারী মানুষের চমক লেগে যাবে। সাজান গোছান ত মোটেই নয় বরং অগোছাল। তুলি, রং, চেয়ার, টেবিল, ছবি প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় জিনিষ চারদিকে ছড়ান। মানুষটার মধ্যে যেন কোথায় একটা পাগল বাস করে। ছবি আঁকতে আঁকতে একটু বাধা পেলেই তাঁর আর ছবি আঁকা হয় না। যতক্ষণ না ছবি মনের মত হয় ততক্ষণ ছবির প্রতি তাঁর কোনও মায়া নেই। ইনিই বাঙলাদেশে একমাত্র শিল্পী বল্‌তে হবে যিনি নারী-চিত্র ভিন্ন পুরুষের চিত্রও আঁকেন। এঁর ছবি আঁকার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। অন্যান্য চিত্রকরের সঙ্গে তাঁর মিল নাই। এই ষ্টাইলটি তাঁর নিজস্ব।

Portrait Painting-এও দেবীপ্রসাদের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, মিসেস্ পার্সি ব্রাউন, জষ্টিস বাক্‌ল্যাণ্ডের কন্যা শ্রীমতী বাক্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি বহুলোকের মূর্ত্তি-চিত্র ইনি এঁকেছেন। জল-রং ব্যবহারে ইনি আশ্চার্য্য রকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছবি ইনি জল-রং-এ আঁকেন। তাতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় না।

অবনীন্দ্রনাথ, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ পার্সি ব্রাউন, কন্‌সাল্টিং আর্কিটেক্‌ট মিঃ ডব্লউ, আই, কিয়ার, বার এট্‌ল, মঃ এ, এন্‌, চৌধুরী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রজনের ব্রঞ্জ ও প্লাষ্টার মূর্ত্তি প্রস্তুত করেছেন।

প্রায় দশ বৎসর যাবৎ ইনি শিল্পকার্য্যে ব্রতী আছেন। এরই মধ্যে এঁর খ্যাতি ও কাজের প্রশংসা Statesman, Englishman, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় একাধিকবার প্রবন্ধ সহ প্রকাশিত হয়েছে।

অর্থ-সাহায্যের অভাবে যে আমাদের দেশের কত দিকের কত তরুণ প্রতিভা উন্নতি লাভ করতে পারে না তা দেবীপ্রসাদকে দেখ্‌লেও মনে হয়। তাঁর মনের অনেক নূতন নূতন জিনিষ তিনি সম্বলাভাবে আজও পর্য্যন্ত রূপ দিতে পারেন নি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের আর একজন নীরব শিল্প-সাধকের নাম উল্লেখ না করলে অপরাধ হয়। ইনি শিল্পী যামিনী রায়। এঁর ছবি অনেকে অনেক পত্রিকায় দেখেছেন। কল্লোলেও এঁর ছবি ছাপা হয়েছে। আমরা এঁর ছবির অত্যন্ত আদর করি। এঁর শিল্প-প্রতিভা আজও বাঙলা দেশ উপযুক্ত সম্মানে সম্ভাষণ করে নেয় নি। ইনি একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণে ছবি আঁকেন। আড়ম্বরহীন মানুষটি, ছবিও তাঁর স্বপ্রকাশ অথচ বাহ্যিক বিলাসশূন্য। বারান্তরে এঁর পরিচয় কল্লোলে দেব বলে আমরা আশা রাখি।

অসলংগ্ন

শ্রীকৃত্তিবাস ভদ্র

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সদাগরের ছেলে রাজকন্যাকে যে বুদ্ধি নিয়ে সন্ধান করে, সে বুদ্ধি বোঝে শুধু রাজকন্যার হাতের কাজ কত দরে কি লাভে বিকোয়। অর্থাৎ সে রাজকন্যার কাছে মোটা রকম কিছু পেতে চায়, যাকে চোখে দেখা যায়, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, যার বিজ্ঞাপন চলে।

এই সদাগরের ছেলে আমাদের সাহিত্যের রাজকন্যার পেছু লেগেছে। তার উদ্দেশ্য ভাল, মনও সরল; কিন্তু কল্যাণ বুদ্ধিটি তার শুধু জাগ্রত নয় নিদ্রাবঞ্চিত। রাজকন্যার বেকার বসে থাকা সে সহ্য করবে না। রাজকন্যাকে একটা কিছু করতেই হবে—তার আদেশে!

যারা বোঝাতে যায় শুধু সেজেগুজে শোভার জন্যেই রাজকন্যাকে রাজকন্যা করা, তাদের সে উত্তর দেয়, কেন সাজাতে ত আমার আপত্তি নেই কিন্তু সাজলে গুজলে কি আর কাজ করা যায় না!

সদাগরের ছেলে সাধুও বটে হিসেবীও বটে; অপব্যয় সে করেও না—দেখতেও পারে না। ফুলের গন্ধে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়—বোঝাতে না পারলে তাকে ফুলবাগান করতে রাজী করান যায় না।

সাহিত্যের কাছে তার কিছু চাই, দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি কিছু না হয় অন্তত সারগর্ভ কিছু নীতিকথা! অভিপ্রায় তার সাধু, মহৎ আদর্শে সে অনুপ্রাণিত, দেশের লোক তাকে শ্রদ্ধা না করে পারে না।

তাই এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের উপকারের জন্যে যখন সাহিত্যরূপী রাজকন্যার অকারণ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় তখন ভীরু কবি ভরসা পায় না কিছু বলতে।

জীবনের কথা জীবনের ভাষায় শুধু বলাতেই যার আনন্দ, যুক্তিতর্ক, নজীর, বিচারের জোরে তার মনের সুস্থতাই অপ্রমাণ হয়ে যায়।

* * *

সদাগরের ছেলের অঙ্কে মাথা পাকা। সে দুনিয়ার সব দুই-এ দুই-এ যোগ করে চার করে দেখাতে পারে, না পারলেও, চার হয় না এ কথা সে কখনো স্বীকার করে না।

জীবনের জটিল, বুদ্ধির অতীত লীলায় বিস্ময়বিমূঢ় যে কবি শুধু জিজ্ঞাসার অদৃশ্য চিহ্নটি রেখে নিরুত্তর থাকে তাকে সে ক্ষমা করে না কিছুতেই। উত্তর না হলে কোন কিছুই তার কাছে সার্থক নয়। দুই-এ দুই-এ চার হওয়া চাই-ই। দর্শন উত্তর দেয়, বিজ্ঞান উত্তর দেয়, শুধু মুখচোরা সাহিত্য ফাঁকি দিয়ে পার পেয়ে যাবে এ যে অসহ্য!

মুখচোরা সাহিত্য হয় ত সবিনয়ে বলে, জীবনকে যে কোন দর্শনের তত্ত্বে আঁটা যায় না, কোন বিজ্ঞানে মেপে তার কূল পাওয়া যায় না। তাই সত্যকারের সাহিত্য এই অনধিগম্য জীবনের প্রতি মানবমনের অন্তহীন কৌতূহলি বিস্ময়ের প্রকাশ!

* * *

ভাষাকে বদ্ধ জলের অচলতা থেকে মুক্তি দিয়ে সচল ক্রিয়ার স্রোতে ভাসাতে এককালে লেখকদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। সংস্কৃতের সংস্কার সে সহজে ছাড়তে চায় নি।

কুলের মোহে সে মরাভাষার কুল আঁকড়ে জীবনের ডাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কান দেয় নি।

ব্যাপারটা এখন কিন্তু অনেকটা সোজা হয়েছে। সাহিত্যের দরবারে কুলীন ভাষার অস্তিত্ব লোপ পায় নি, কিন্তু তার পাশে চলতি ভাষার আসন মঞ্জুর হয়েছে। কুলীন ভাষার ভাঙা বেড়া টপকে নাম গোত্রহীন দেশজ শব্দের আনাগোনাও সুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু কুলের গোঁড়ামি যেতে না-যেতে আরেক নতুন ভাঁড়ামি শুরু হয়েছে—ভাষার ধর্ম্মান্ধতা! শুদ্ধ ভাষার সেবায়েৎরা ভাষার দরজা আটকে উর্দ্দু, ফারসী শব্দ বাঙলায় ঢুকতে দেবেন না। শব্দের গায়েও তাঁরা লুঙি ও মাথায় ফেজ আবিষ্কার করে ক্ষেপে উঠেছেন। ধর্ম্মের নামে দেশের হীন কলহকে তাঁরা ভাষার মাঝেও টেনে আনতে চান। তাঁরা দীর্ঘ ভাবে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেবেন, তবু এক কথায় 'শহীদ' হবেন না, গোঁড়ামির শৃঙ্খলে ভাষাকে পঙ্গু করে রাখবেন, তবু 'জিঞ্জির' ভাঙবার কথা বল্লে রেগে আগুন হবেন।

কিন্তু তাঁরা বোধ হয় জানেন না, ভাষার 'জমি'তে বহুকাল হতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্বিশেষে বিদেশী শব্দ শিকড় গেড়ে এমনি করে আপন হয়ে আসছে; তাদের ওপড়ান যায় না, আটকাতে যাওয়াও বেয়াকুবী।

ভগবানের রাজ্য

শ্রীকিরণকুমার রায়

একখানা ছেঁড়া বই ...

আঠারো থেকে তিরিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাত্তাই মেলে না—

সাতের অধ্যায় অবধি দিব্যি ; মা-বাপের আদরের মেয়ে খুকুমণি, দুই ছেলের পরে এক মেয়ে—মা কোল ছাড়া করেন না, কাজের ফাঁকে বাবা বার বার এসে দেখে যান্। বড়ভাই এসে চুমু দিয়ে ছোট মুখটাকে রাঙিয়ে দেয়, ছোট ভাই লজেঞ্চুস নিয়ে এসে বলে, এই নে খুকু—

খুকু খুশী হয়ে হাত বাড়ায়।

আটের অধ্যায়ে মা মারা যান্—

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর আনন্দ নিঃশেষে মুছে নিয়ে যান্।

মুখে আর পায়ে সিঁন্দুর দিয়ে, যখন মাকে শ্মশানে নিয়ে যায় তখন বাপের কোল ঘেঁসে এসে দাঁড়ায় খুকু।

বাপ তাকে কোলে নিয়ে তার বুকে অসহায়ের মত মাথা গোঁজেন—

চোখ ভরে আসে কিন্তু শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান, ভাবেন পুরুষ মানুষের কাঁদতে নেই,—তারপর ঘরের চারদিকে চান, সব অগোছাল, যে কর্ত্রী ছিল এখন সে নেই—এবারে ঘরের কর্তৃত্বও তাঁর—

টাকপড়া মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে ভাবতে আন্মনা হন্।

দশের অধ্যায়ে খুকু শিউলী হয়।

রোজ সকালে বিকালে পড়্তে হয় মাষ্টারের কাছে, মাষ্টার মশায় পড়ান—

> "সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্ব্বময়
> সর্ব্বদেশে পূজ্য তুমি সকল সময়।"

—শিউলী মুখস্ত করে।

সন্ধ্যাবেলায় গানের মাষ্টার আসে –

এস্রাজ নিয়ে পা-দুটিকে পিছনে বেঁকিয়ে বসে শিউলী, মাষ্টার স্বরলিপি দেয়। শিউলী এস্রাজে ছড় দিয়ে তোলে—

'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য—

বাইরে বাবার বৈঠকখানায় সে সুর গিয়ে পৌছয়, তিনি মক্কেলকে জটিল প্রশ্ন বোঝাতে বোঝাতে হঠাৎ উঠে পড়েন, বলেন, 'আজ থাক্ তারক বাবু, কাল ভোরে আসবেন, শরীরটা বড় ভাল লাগ্ছে না।'

ভিতরে এসে শিউলীর পড়ার ঘরে ঢুকে গানের মাষ্টারকে ছুটি দেন, বলেন, 'কাল বেলা থাক্তে আস্বেন—'

মাষ্টার চলে যায়, তখন বাপ্ আর মেয়েতে কথা হয়,—কত কথা ; বাপ বলেন, 'খুব ভাল গাইত তোর মা,—সে থাক্লে আজ কি তোর জন্যে গানের মাষ্টার রাখতে হয়!'

শিউলী এখন বোঝে—তাই মা'র কথা বাবাকে তুল্তে দেয় না—

পরণের ফ্রকটার দিকে চেয়ে বলে, কি বিচ্ছিরি বেমানান এই ফ্রকটা, হাঁটুর নীচে নামে না, আমি এখন বড় হয়েছি, আর ফ্রক পরবো না, এইবারে শাড়ী কিনে দিতে হবে—রাঙা পেড়ে শাড়ী—'

বাবা বলেন, 'তোর মাও রাঙা পাড় পছন্দ করত।'

তারপর বাবা গাড়ী নিয়ে শিউলীকে দোকানে নিয়ে যান।

বাড়ী ফিরে এসে দাদাকে নূতন জামাকাপড় দেখায় শিউলী, বড়দা ঠাট্টা করে বলে 'ওগুলো জামা নয়—ও হচ্ছে ছেঁড়া ছালা!"

শিউলী আমার দিকে চেয়ে দেখে, বলে, 'যাঃ, মিছে কথা !' তারপরে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'তুমি মিছে কথা কইছ, দেখো ঠাকুর তোমার কি করেন !'

এম্নি করে চোদ্দর অধ্যায়ে এসে পৌছয় বইখানা, বিয়ের ঘটক আনাগোনা করে, বাবা সবাইকে তাড়িয়ে দেন, বলেন, 'মেয়ের বিয়ে আমি দোবো না।'

তারপর আর একদিন আর এক বুড়ো আসে, রিটায়ার্ড সেসন জজ, শিউলীর বাবার আবাল্য বন্ধু,—এসে শিউলীকে দেখেন, তার হাতের তৈরী খাবার খান, গান শোনেন—যাবার সময় বলে যান, 'তোমার মেয়েটি আমায় দিতে হবে, আমার একটি মাত্র ছেলে,—পুনাতে এগ্রিকালচার পড়ে—'

পনের অধ্যায়ে বিয়ের সানাই বেজে ওঠে—

শ্বশুরবাড়ী যায় শিউলী, মনোহর পুকুর রোডের উপর তিনবিঘা জমিতে বাড়ী আর বাগান, মোটর ঘোড়াতে বাড়ীর চারপাশ থৈ থৈ করে, কিন্তু বাড়ীর ভিতরে সব চুপচাপ।

শিউলীর শাশুড়ীর মাথার ব্যামো।

সারারাত্রি তিনি বকেন।

'সেই যে শিশির গাঙ্গুলী, সে আমার চাবী নিয়ে গেল কেন ?'

'পীদিমটা জ্বালি বৌ, আলো হোক, যে ঘুরঘুট্টে আঁধার—'

আবার বলেন, 'বৌ আমার নয়, ও রাক্ষুসী সব খাবে—'

এমনি সব কত কি !

মাকে দেখতে স্বামী নরেশ রাত্রে উঠে উঠে যায়, শিউলীর চোখে অশ্রুজলের বান ডাকে।

চোখ মুছে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে, বলে, 'মাকে ভাল করে দাও ঠাকুর !'

শ্বশুর নীচে ঘুমোন।

অনেক রাত্রে নরেশ গিয়ে তাকে আস্তে ডেকে আনে—উপরে এনে শুক্ পাখীর ডাক শোনায়,—

পাঁচমিনিট অন্তর পাখী ডাকে।

শ্বশুর ছেলেকে সান্ত্বনা দেন, শিউলী বেরিয়ে আসে শোবার ঘর থেকে। এসে শ্বশুরের কাছে দাঁড়ায়—শ্বশুর, তার দিকে চেয়ে বলেন, 'কিরে ভয় করছে ?—আচ্ছা চ, আমি ওপরে গিয়ে শুচ্ছি।'

আবার ভোর হয়, শাশুড়ীর বকুনী থাবে।—

তখন শ্বশুর শিউলীকে ডেকে নিয়ে যান। বলেন 'গান গা' বাঁয়াতবলা টেনে এনে বলেন, 'আমি বাজাই—"

শিউলী হারমোনিয়াম বাজিয়ে টোরী আলাপ করে, শ্বশুর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন, শিউলী খুশী হয়।

নরেশ মুখ নামিয়ে ঘরে ঢুকে, বল্লে, 'বাবা, মা'—

শ্বশুর ধড়মড়িয়ে উঠে চটী না পরেই ওপরে ছুটলেন, নরেশ ডাক্তারকে টেলিফোঁ করতে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে গান বাজনা সব ডুবে গেল।

বাড়ী থেকে 'হরি বোল' বলে কান্না সব নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বছর ফিরুতে শিউলীর টুকটুকে ছেলে হ'ল। পলাশ, ফুলের মত ঠোঁট তার, তাই দাদু তাকে আদর করে ডাকেন 'পলাশ'—

সতের অধ্যায়ে পলাশ বড় হতে থাকে। নরেশ চাকরী পায়, রিটায়ার্ড সেসন জজ পৃথিবী হ'তে রিটায়ার করেন, মনোহর পুকুরের বাড়ী তালা চাবি বন্ধ হয়, তার ঘরে ঘরে মাকড়সা জাল বুনতে শুরু করে, বাগানের পথে শুক্‌নো পাতারা স্তরে স্তরে শয্যা বিছোয়।—

নরেশ চাকরী নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়।

* * *

বার'খানি অধ্যায় একেবারে চোখে পড়ে না।

একটা ছেঁড়া পাতাও না, তার একটা আখরও না।

মনোহর পুকুরের বাড়ীটা খাড়া থাকে শুধু—তার সদর অন্দর-সব খাঁ খাঁ করে, দেয়ালের চুন সুরকী খসে খসে পড়ে, শুক্‌নো পাতাগুলি নিশ্চিন্ত আলস্যে

এ-পথ হতে ও-পথে উড়ে বেড়ায়, পুকুরে শ্যাওলা জন্মে, বাগানের গন্ধরাজের সার মরে কাটাগাছ জন্মায় অনেক।

* * *

তিরিশ অধ্যায়ে শিউলী ফিরে আসে, সিঁথির সিন্দুর মুছে সাদাপেড়ে শাড়ী পরে—নিরাভরণ; পলাশ আসে সঙ্গে, আর আসে ঝি চাকর বামুন দরওয়ান।

শিউলীর চোখের কোণে কালি পড়া, মুখে ক্লান্তির ত্রিবলী রেখা—তবুও পলাশকে আদর করে, তাকে খাইয়ে দাইয়ে গাড়ীতে স্কুলে পাঠায়, রোজ সকাল সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রণাম করে সে।

ঘরে একধারে শ্বশুরের অয়েল পেন্টিং, অন্যধারে নরেশ, সাহেবী পোষাক তার, শিউলী সেদিক চাইতে পারে না, জানলা দিয়ে পলাশের ফেরার পথের দিকে বারে বারে চায়।

পলাশ স্কুল থেকে ফেরে।

শিউলী তার মুখে সিগারেটের গন্ধ পায়, কিন্তু তিরস্কার করতে পারে না।

আহ্নিকের সময় বারেবারে প্রার্থনা করে, 'আমার পলাশ যেন মানুষ হয় ঠাকুর—কিন্তু মানুষ হয় না পলাশ।

বারে বারে পরীক্ষায় ফেল করে সে বারবাড়ীতে এসে মাকে বকে—

চুপ করে থাকে শিউলী—তার নিজের পড়াশুনার কথা মনে পড়ে—

মাষ্টার বলেছিলো, 'এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চট্‌চট্‌ সব ধরে ফেলে, পলাশের বাবা দাদামশায়ও ত মূর্খ ছিলেন না।

তবে পলাশ কেন এমন হয়?

হেরিডিটির সূত্রে পলাশ বাঁধা পড়ে না, শেষে লেখা পড়া ছেড়ে দেয় আর এ-য়ার বক্সীদের সঙ্গে থিয়েটার করে ঘুরে বেড়ায়,—অনেক রাত্রে যখন ফেরে তখন শিউলী তার সম্মুখে যায় না—বিছানায় একবার ঋজু হয়ে বসে, শোনে পলাশ চ্যাচাচ্ছে—শ্বেতন, বাড়ীর বুড়ো চাকর, পলাশ তাকে গলা ঝাঁকুনী দিয়ে বলছে—"ইউ সন্ অব এ—'

শিউলী কানে আঙুল দিয়ে শুয়ে পড়ে।

নরেশ ছিল ফ্রি-ম্যাসন।

তার ছেলের এ কী দুর্দ্দশা, শিউলী ভাবে—।

রাত্রি শেষ হয়, সকাল দুপুর কেটে যায়—।

পলাশ শিষ দিয়ে দিয়ে ঢিলা পায়জামা প'রে তার ঘরে ঘুরে বেড়ায়, ফাউলিং পিস্ নিয়ে বেরিয়ে পাখী মারে,—।

শিউলী সব টের পায়।

বিকাল বেলা এসে পলাশ টাকা চায়—দুশো টাকা—

শিউলীর মুখ চোখ হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে।

তারপর ঝনাৎ করে ড্রয়ারের চাবি ফেলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়, গিয়ে ঘরের মেজে আঁকড়ে ধরে কাঁদে—।

কী কান্না সে!—মার্বেলের মেজে পর্য্যন্ত ভিজে যায়।

পলাশের মোটর গাড়ীর হর্ণ বেজে ওঠে, পরিচিত হর্ণ— পেজ গাড়ীর। নরেশ ঐটিতে আপিস্ হতে ফিরত—।

দেওয়ালের ফটো থেকে নরেশ শিউলীর দিকে চায়, শিউলীর স্বপ্ন ভাঙে।

তখন ঝি এসে বলে, মা, দাদাবাবু আজ ফিরবেন না ব'লে গেলেন—।'

ঝি দাঁড়িয়ে থাকে, খামকা তার উপর রেগে ওঠে শিউলী, চেঁচিয়ে বলে 'দাঁড়িয়ে রইলি যে, শুনলুম ত, যা এখান থেকে—'

ঝি তবুও যায় না, বলে, 'তোমার আহ্নিকের সময়—'

শিউলী উঠে দুদ্দাড় ক'রে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। ঝি পিছনে যায়।

আটত্রিশ অধ্যায়ে শিউলী বুড়ি; সবাই এসে বলে 'পলাশের বিয়ে দাও—।'

শিউলী বলে, 'না।'

তখন সবাই বলে, 'এমন বিগ্‌ড়ে গেল ছেলেটা—' তারপর চলে যায়।

টাকা সমস্ত ফুরিয়ে আসে, মনোহর পুকুরের বাড়ীর আর সে শ্রী নাই, শিউলীর সঙ্গে সঙ্গে সেও বুড়ী হয়েছে—

গ্যারেজ ফাঁকা, গাড়ীটাড়ী সব গেছে, ঝি বামুন নেই, আছে শুধু খেতন—মাইনা নেয় না সে।

পলাশ বাড়ী ফেরে না।

তারপর একদিন খবর আসে বাড়ী বার হাজার টাকায় মর্টগেজ দিয়ে পলাশ টাকা ধার করেছিল; সুদে আসলে এখন পাওনা হয়েছে বিশ হাজার; টাকা দিতে হবে।

দালালরা যাতায়াত করে।

শিউলী আড়াল থেকে তাদের সাথে কথা কয়, তারা সান্ত্বনা দেয়, বলে, 'ভাবছেন কেন?—আবার ধার হবে— বাড়ীটা বাইশ হাজার টাকায় বেচুন—'আমরাও ত মানুষ, এতে আপনার ক্ষেতি হবে না।'

শিউলী ভাবে তিন বিঘে জমি, ছ'কাঠার ওপর বাড়ী, কাঠা পিছু যদি হাজার টাকাও হয় বাড়ীর দাম বাদ দিয়ে শুধু জমির দাম কত দাঁড়ায়। বলে, 'আমার ছেলের সঙ্গে কথা কইবেন, সে না হ'লে হবে না, তারি সব—আর আমি ত ও সব কিছু বুঝি না, কাল আসবেন—'

দালালরা মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে ফিরে যায়।—

টালার এক খোলার ঘরে চল্লিশের অধ্যায়ের আরম্ভ হয়। ব্যাধিগ্রস্ত পলাশকে নিয়ে শিউলীর দিন কাটে, তেল চিট্‌চিটে মাদুরের ওপর শুয়ে পলাশ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করে, লিবারের বেদনা—চ্যাচায়, 'মাগো'—

শিউলী এসে কাছে বসে, গায়ে হাত বুলোয়, কুলুঙ্গীর ডিবে থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে ঘর কালি করে, তার উপরে একখানা কালী-মূর্ত্তি, ধোঁয়ায় তাকে দেখা যায় না;— বসে থাকে শিউলী, আর বাতাস দেয়।

সকাল বেলায় ডাক্তার এল বল্লে, 'লিবার অ্যাব্‌শেস, অপারেশন করতে হবে, হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও।—'

পলাশ কাতর হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে রইল; শিউলী চুপ করে খানিক শুনে কোথা থেকে দু'গাছা চুড়ি এনে ডাক্তারকে দিয়ে বল্লে, 'এতে হবে না?'

ডাক্তার আশা দিয়ে চলে গেল।

অ্যাম্বুলেন্স এল। শিউলীর চোখের ওপর পলাশকে কারা সব ষ্ট্রেচারে তুলে নিয়ে গেল।

* * *

বেলগাছিয়া হাসপাতালের ওয়ার্ড, বেড নম্বর ১০৩! আশে পাশে কত রুগী, একজন কাতর হয়ে নাকিসুরে 'আর পারি নে।'—আর একজন, বয়স তার এগার কি বার, পলাশকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমার দেহ কবে সারবে?' সারা রাত্রি পলাশের ঘুম হয় না, আব্‌ছা আলোয় তার বিগত জীবনের দিনগুলি ফুটে ফুটে ওঠে,—মাকে মনে পড়ে তার,— ভাবে কাল তার অপারেশন—।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় শিউলী এসে হাসপাতালের দরজায় দাঁড়াল; কোথায় রেখেছে পলাশকে,—সে খোঁজ করে।

পাশে হাউস-সার্জ্জনের বাড়ী, দেখা চাইতে, দারওয়ান হাঁকিয়ে দিলে; শেষে খোঁজ পাওয়া গেল, বেড নম্বর ১০৩—পূব দিকের বাড়ীতে ডান হাতি ঘরের বাঁ কোণে—

শিউলী ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল; ওয়ার্ড অ্যাসিসটেণ্ট ওষুধের শিশি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-বেড থেকে ও-বেডে, শিউলীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি চাই তোমার?' শিউলীর গলা দিয়ে কথা বেরয় না, কোন মতে বল্লে, 'পলাশ কান্তিসেন, ১০৩ নং বেড। ওয়ার্ড অ্যাসিটান্ট বল্লে, 'লিভার অ্যাবসেসের রোগী ত? বেডটা দেখিয়ে দিয়ে চলে যেতে যেতে বলে গেল, 'আজ তিনটেয় খতম হয়ে গেছে তার—'

খালি বেডটা শিউলীর দিকে প্যাট প্যাট করে যেন চেয়ে আছে।

ওয়ার্ড অ্যাসিসটান্ট আর একবার এসে জিজ্ঞাসা করে গেল, 'কে ছিল সে তোমার?'

শিউলী শুধু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বেরিয়ে এল, চোখে তার জল নেই।

হাসপাতালের বাইরে বাড়ী ফিরতে কালীমন্দির ; সেখানে তখন আরতি ! পথ-চল্‌তি লোকে নমস্কার করে, আর কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে।

সেদিকে শিউলী চায় না ; নজরেই পড়ে না তার কিছু— বরাবর সব অতিক্রম করে তার দৃষ্টি ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ্ণ হয়ে ঘুরে বেড়ায়—একটা খালি বেডের চার পাশে—

এর পরে বইখানি চোখের জলে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

অশ্রুজল

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

পেলব আঁখির পলব ভিজায়
ওই যে তরল বিন্দুচয়,
শুক্তি-ব্যথার মুক্তা ওরা
নয় গো কভু তুচ্ছ নয়।

দুঃখ-দহের পঙ্ক হ'তে
কাঁটার মৃণাল বৃন্ত 'পর
ওরাই ফুটে শুভ্র কুমুদ
মেলিয়ে অভ্র দলের থর !

মুখের ভাষায় হয় না প্রকাশ
বুকের মাঝের যেই ব্যথাটি,
ওরাই তাহার মূর্ত্ত প্রকাশ
অর্থভরা সে-ই কথাটি !

পেলব আঁখির পলব ভিজায়
ওই যে তরল বিন্দু গো,
ওরই তলে দুল্‌চে মনের
বিপুল ব্যথার সিন্ধু গো !

—o—

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম বার আনা মাত্র।

পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া তাহার সত্তা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। কাছের অনেক ছোট জিনিষ বড় হইয়া দেখা দেয় এবং দূরের বৃহত্তর অনেক কিছুই অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে।

তথাপি গ্রন্থকার যে সহজ সরল কৌশলে কবিকে বিনা আড়ম্বরে শিশুদের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা সত্যই বড় মধুর, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। জননী প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে এবং পিতৃ-পিতামহের প্রভাবে শিশু রবির তেজ ও দীপ্তি ক্রমশ প্রস্ফুট হইয়া কেমন করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল,—মহামানবতার এই দিগ্বিজয় যাত্রার চিত্র গ্রন্থকার শিশুদের উপযোগী এবং উপভোগ্য ভাষায় বড় সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন।

কবির বিভিন্ন বয়সের ভূমিকার কয়েকটি, তার পিতা-পিতামহ ও শান্তি নিকেতনের কয়েকটি এবং আরও দুই একটি ছবির সাহায্যে এই পুস্তকখানিকে যথাসম্ভব সুদৃশ্য ও সুখপাঠ্য করা হইয়াছে।

যে সুন্দরের অঙ্গের জ্যোতিতে কবির চক্ষু দুইটি মুগ্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাঁর সঙ্গ পাইয়া তাঁর অঙ্গ পুণ্য এবং অন্তর ধন্য হইয়াছে, গ্রন্থকারের সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও আশা করি—সেই 'অনন্তসুন্দরের অন্তরতম প্রতিকৃতিটি আমাদের ছেলেমেয়েদের সরল শুভ্রচিত্তে প্রতিফলিত হ'য়ে তাদের নবীন প্রাণগুলিকে বিকশিত করুক্, উন্নত করুক্ ধন্য করুক।'

বইখানির ছাপা পরিপাটী, বাঁধাই বেশ শক্ত। মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম। কয়েকটি তুচ্ছ ছাপার ভুল না থাকিলে পুস্তকটি আরও সুন্দর হইত।

———

ছেলেদের বিদ্যাসাগর :—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।—দাম মাত্র দশ আনা।

দূরত্বের মোহ সকলকেই অভিভূত করে, বিশেষ করিয়া সে দূরত্ব যখন ইহকাল পরকালের ব্যবধান হয়। মহামানবের জীবনেতিহাস যে মানবত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ভিন্ন অতিমানবতার অতিরঞ্জন নহে—বিদ্যাসাগরের জীবনকথা বেশ সহজ সরল ভাষায় গ্রন্থকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপযোগী করিয়া লিখিয়া তাহা দেখাইয়াছেন! ইহার ভাষা যেমন মিষ্ট, পরিকল্পনাও তেমনই সুন্দর এবং সুনিয়ন্ত্রিত।

'পাড়ার লোকের বাগানে ঢুকে চুপি চুপি ফল পেড়ে খাওয়া', 'ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধানের শীষ ছিঁড়ে নষ্ট করা—এই রকম সব দুষ্টুমির জ্বালায় পাড়ার লোক, গ্রামের লোকের অস্থির হয়ে ওঠা ইত্যাদি বিদ্যাসাগরের মত একজন মহামানবের জীবনেও যে এই সনাতন

চিরচঞ্চল শিশুপ্রকৃতির বিকাশের কোনও ব্যতিক্রম বা পক্ষপাতিত্ব ছিল না ইহা আমাদের শিশুদিগের পক্ষে মস্ত বড় একটা সুসংবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের অনেকগুলি বিচিত্র ঘটনার এবং মানসিক সংগ্রামের নিখুঁত ছবিই এই পুস্তকখানির বিশেষত্ব। মুখের একটি কথা, ছোট একটি কাজ, সামান্য একটি ঘটনার মধ্য দিয়া শিশু ঈশ্বরচন্দ্র ধীরে ধীরে কেমন করিয়া বড় হইয়াছিলেন, ছেলেমেয়েদের প্রতি আন্তরিক দরদ এবং সেই মহাপুরুষের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা লইয়া এই বইখানি লিখিত।

শিশু-মহলে এমন কি তাঁহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছেও ইহার যথেষ্ট সমাদর হইবে। বাংলা ভাষায় এইরূপ জীবন-কথা আরও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইহাতে মোট সাতখানি ছবি আছে। বাঁধাই বেশ মজবুত এবং দামও কম। ছাপা পরিষ্কার—কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে।

হ

আগমনী—"বঙ্গনারী" প্রণীত। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার চক্রবর্ত্তী-চ্যাটার্জ্জি কোং লিমিটেড হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ টাকা। ডিমাই আট পেজী, ৩৩৭ পৃষ্ঠা, পুরু অ্যান্টিক কাগজে ছাপা।

এই উচ্ছ্বাস আতিশয্যপূর্ণ কথার দিনে বইটির বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। ইহার ভাষা 'পুষ্পিত প্রলাপ' নহে, সুচিন্তিত, সুমার্জ্জিত, সুসম্বদ্ধ এবং সুসংযত। সমস্ত প্রবন্ধেই বেশ একটা দৃঢ়তা অথচ সাবলীল ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা যুক্তিদ্বারা, দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন করিয়া দেখাইয়াছেন। লেখাগুলি এমন চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহার কারণই এই যে, এগুলি কল্পনা-বিলাসমাত্র নহে, ইহার পিছনে লেখিকার সত্যকার অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং বেদনা রহিয়াছে। নারী-বিষয়ক সমস্যাগুলিকে তিনি আপন বিচারবুদ্ধি দিয়া কষিয়া দেখিয়াছেন, প্রচলিত মতামতকেই শিরোধার্য্য করিয়া ল'ন নাই। কোন 'সাময়িক উত্তেজনা বশে' বা 'সাহিত্যিকতার দুরাশা' লইয়া প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই, সে কথা লেখিকা ভূমিকাতেই বলিয়াছেন।

বক্তব্য-বিষয়ে Balance-জ্ঞান এবং গোঁড়ামি-বর্জ্জিত সরল আলোচনা—এই দুইটি জ্ঞানের জন্য বইখানি দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া যায় না। ইহা রক্ষণশীলতার জয়গানে এবং বিদ্রোহের রুদ্র উচ্ছ্বাসে 'থেই' হারাইয়া ফেলে নাই; শান্ত স্থির যুক্তিমত্তায় প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। তাই কোন-দলকেই লেখিকা এক-তরফা ডিক্রী দিয়া যা'ন নাই, আর দলাদলির মোহেও আপনাকে সম্পূর্ণভাবে জড়াইয়া ফেলেন নাই, সমস্যাগুলিকেই আপন বিবেচনা দিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছেন।

নারী-বিষয়ক সমস্ত কিছু লইয়াই লেখিকা আলোচনা করিয়াছেন। শিক্ষা, বিবাহ, ফ্যাসন, প্রেম, দেহচর্য্যা পাতিব্রত্য, বৈধব্য, বিবাহচ্ছেদ, নারীর অধিকার—প্রভৃতি নারী-সমস্যাকে যতদিক হইতে ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে, সব দিক্ দিয়া চিন্তা করিয়া লেখিকা যুক্তি সাহায্যে আপন মত জানাইতে চাহিয়াছেন।

মেয়েদের আজ আমাদের সমাজে যে ভাবে 'অবলা' করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহা হইতে মুক্তির প্রয়োজন এবং যাহাতে সত্যসত্যই জগতের উন্নতির জন্য নর নারী একসঙ্গে কাজ করিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য—ইহাই লেখিকার মোট বক্তব্য। কোন দেশেই আজ পর্য্যন্ত নারী আপনার যোগ্য আসন লাভ করে নাই। পাশ্চাত্য সমাজও নারীত্বের পূর্ণ আদর্শ ধরিতে পারে নাই। সেখানে নারী আপন বলে কতকগুলি বাহ্য অধিকার লাভ করিয়াছে মাত্র, তাহার অন্তরের মহিমা যথাযোগ্য মর্য্যাদালাভ করে নাই, সে মহিমা সুন্দর শতদলের মত পূর্ণ বিকশিত হইয়া বর্ণে গন্ধে সমাজকে ভূষিত করিতে পারে নাই। বাইরের অধিকারের সঙ্গে কতকগুলি উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। নারীর অন্তরের জাগরণই কাম্য। কবে স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, জ্ঞানে, দিব্যশক্তিতে জাগ্রত হইয়া নারী আপন মহীয়সী কল্যাণী মূর্ত্তিতে দেখা দিবে এবং সমাজকে নবভাবে, নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ

ও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে—নবীন বঙ্গ সেই 'আগমনীর' স্বপ্নই আজ দেখিতে চাহিতেছে।

ধী

স্বপ্নপুরী—শ্রীঅখিল নিয়োগী। ৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কুলজা সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

এ খানা ছেলেমেয়েদের সচিত্র গল্পের বই। লেখক কেবল লেখকই নহেন, চিত্রশিল্পীও বটেন। তাই লেখার মধ্যে সত্যিকারের উপভোগ করার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। গল্পগুলি যাদের জন্য রচিত তারা পড়ে যে খুবই খুশী হবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ছবি ছাপা বাঁধাই চমৎকার। আশা করি ছেলেদের অভিভাবকগণ এই বইখানার অনাদর করবেন না।

বাবমামা—শ্রীঅখিল নিয়োগী। প্রকাশক কুলজা সাহিত্য মন্দির, ৩০ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দাম ছয় আনা।

এই বড় গল্পটি লেখক বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে লিখেছেন, স্থানে স্থানে ওস্তাদ শিল্পীর তুলির পোঁচও এতে দেখতে পাওয়া যায়। গল্পটি পড়তে পড়তে ছেলেরা যে ভয়ে বিস্ময়ে কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকগুলি ছবিও এতে আছে, সুতরাং শিশুদের মনোরঞ্জনের দিকে প্রকাশকের এই চেষ্টা প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য।

অভিশাপ—শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী। পি-৮১ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে দি বুক ষ্টল কর্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

এই ছোট বইখানা বিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস "লাষ্ট ডে অফ পম্পিয়াই" নামক বইয়ের শিশু-সংস্করণ। রচনায় লেখকের কৃতিত্ব সুস্পষ্ট। ভাষা মনোরম। খান কয়েক ছবি দিয়ে আরো মনোজ্ঞ করে তোলা হয়েছে।

মাধবীর বিদ্রোহ—শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য। যশোহর। মূল্য ১৷৹ আনা মাত্র।

এ-খানা ঠিক উপন্যাস নয়, এতে চাকরি না করেও কেমন করে বাঙালী আজ জীবিকার্জ্জন করতে পারে তারই নির্দ্দেশ আছে। লেখকের ভাষা সরল, সহজ এবং বক্তব্য বেশ সুস্পষ্ট। তাঁর রচনার উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই দুর্দ্দিনে বাঙলার যুবকগণ যে এ বইখানা থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। এই বইখানা অনাদর লাভ করলে দুঃখের কথা হবে।

বাঁচিবার উপায়। শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য, যশোহর। মূল্য একটাকা।

কেমন করিয়া এই দৈন্য দুর্দ্দিনে বাঙলী বাঁচতে পারে এই বইখানায় তারই ইঙ্গিত রয়েছে এবং সে কার্য্যে গ্রন্থকার যথেষ্ট নিপুণতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি দেশবাসীকে স্বাবলম্বী হতে অনুরোধ করেছেন। এই সব দিকেও যে দেশের লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে তার প্রমাণ এই বই দুখানা। গ্রন্থকারের শ্রম সফল হলে আমরা খুশী হব।

নারী—শ্রীগঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

ইহা একখানি কবিতার বই। লেখক একজন নাম-করা কবি, ইতিপূর্ব্বে তাঁর আরো খানকয়েক কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে গঙ্গাচরণ বাবু সাময়িক পত্রে রচনা প্রকাশ করেন না বলে তাঁর কবি-প্রসিদ্ধি অনেকের নিকটই অজানা রয়ে গেছে। এই বই-খানা পড়ে আমরা খুশী হয়েছি, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট। আশা করি কবিতা-প্রিয় বাঙালীর নিকট এর যথেষ্ট সমাদর হবে।

শিশুমহল—সচিত্র ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্র। সম্পাদক—মোহাম্মদ আফজাল-উল্ হক, মোসলেম

পাবলিশিং হাউস, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য চোদ্দ পয়সা। ভাদ্র মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। কাগজখানা যে ছেলেমেয়েদের আদর লাভ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছাপা কাগজ ছবি সবই শিশুদের মনোরঞ্জন করবে। আমরা এ পত্রের সাফল্য কামনা করছি। প

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক দৃশ্যকাব্য—মন্মথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য এক টাকা।

বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্য। শুধু গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ছাড়া বাঙলার সাহিত্য-প্রতিভা অন্য কোন পথে বিশেষ শক্তির পরিচয় আজো দিতে পারে নি। বাংলার কথা ও কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেখানে সংস্কার মুক্ত মন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে বঙ্কিমবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র হয়ে শৈলজানন্দ পর্য্যন্ত একটা যোগসূত্র পাওয়া বিশেষ কঠিন হয় না। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যে যে ক'টি প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত বিকশিত হয়েছে তারা প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন। অতীত থেকে কোন প্রেরণা তার পায় নি বা নেয় নি এবং ভবিষ্যৎকেও তারা কোন প্রেরণা দেয় নি। দীনবন্ধু মিত্র, গিরীশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র-সকলেই নাট্য সাহিত্যে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ কারো আত্মীয় নন। শরৎচন্দ্রের কথা বাদ দিয়ে বাকী সকলের সম্বন্ধেই বলা চলে যে, নাট্য-সাহিত্যে তাঁরা সাড়া তুলেছেন কিন্তু নাড়া দিতে পারেন নি। তাঁদের প্রতিভা আপনার মধ্যে আপনি সমাপ্ত। নাট্য-সাহিত্যের মুখ তাঁদের কারুর প্রেরণায় আজো খোলে নি। তাই পাদপ্রদীপের আলোক অযোগ্য অপটু হাতের বিসদৃশ সৃষ্টিকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

নাট্য-সাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীমন্মথ রায়ের কাছে আশা করা যেতে পারে। আসরে তিনি খুব অল্প দিনই নেমেছেন কিন্তু তাঁর লেখা এর মধ্যেই সুপরিচিত হয়েছে। তাঁর কলমের কাজ শুধু সূক্ষ্ম নয়, জোরালো ও রঙদার। ইবসেন, মেতারলিঙ্কের কাছে হয়ত তাঁর প্রথম দীক্ষা কিন্তু অনুকরণ ও অনুকরণের আভাষ তাঁর লেখায় নাই বল্লেই চলে। 'চাঁদ সদাগর'-এর ফরমাজী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে তাঁর কলম বোধ হয় ভাল করে খেলতে পায় নি। তা সত্বেও নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়।

চয়নিকা—কবিতার বই। লেখক শ্রীযোগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছাপা বাঁধাইর জন্য বেশ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু কবিতাগুলি নিরর্থক বাক্যযোজনা। যেমন সস্তা ভাব, আড়ষ্ট ভাষা, তেমনি পঙ্গু ছন্দ। মাকাল ফলের মত এর বাহ্য সৌষ্ঠবটুকুই আছে।

স্বাধীন বাঙলা—শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা প্রণীত। প্রকাশক বর্ম্মন পাবলিশিং হাউস, মূল্য এক টাকা।

পশ্চিমের প্রভাবে আমাদের শুধু অতীতের জাতীয় ও মানসিক জীবন-ধারা থেকে বিচ্ছেদই হয় নি, সে সম্বন্ধে বিস্মৃতিও ঘটেছে। বাংলার ভাব ও কর্ম্মজীবনের যে বিশিষ্ট রূপ ছিল তা আমরা একেবারে ভুলেছিলাম। ধীরে ধীরে যে আমাদের বিরূপ মন আবার সে জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করছে, এটি আশার কথা।

'স্বাধীন বাঙলা' উগ্র রাজনীতিক উচ্ছ্বাসের বই নয়, বাংলায় যে স্বাধীন বিশিষ্ট জাতি-সত্ত্বা ছিল তার কিছু পরিচয় এ বইটিতে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ চেষ্টা সাধু।

সমাজ—প্রবন্ধসমষ্টি—৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রণীত। বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত; মূল্য দশ আনা।

৺ব্রহ্মবান্ধবের বিপুল চিন্তাশীলতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অসীম জ্ঞান বিদ্যা ও অসামান্য প্রতিভা সম্বন্ধে আর নতুন কি বলা যেতে পারে ভেবে পাই না। শুধু যাঁরা পড়েন নি তাঁরা নয় যাঁরা আগে এ লেখাগুলি পড়েছেন তাঁদেরও ফিরে পাঠ করা প্রয়োজন।

ঝরা পালক—কবিতার বই, শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত প্রণীত। দাম এক টাকা।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত কাব্য-সাহিত্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তরুণ কবির সমস্ত কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিত। তাঁর ছন্দ ভাষা ভাব সবেতেই বেশ বেগ আছে। ত্রুটি যা-কিছু আছে তা কখন কখন সেই বেগের অযথা আতিশয্য। নজরুল, মোহিতলালের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি বটে কিন্তু সে প্রভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যের পথে ফেরাতে পেরেছেন বলে মনে হয়। প্র

ও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে—নবীন বঙ্গ সেই 'আগমনীর' স্বপ্নই আজ দেখিতে চাহিতেছে।

ধী

স্বপ্নপুরী—শ্রীঅখিল নিয়োগী। ৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কুলজা সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

এ খানা ছেলেমেয়েদের সচিত্র গল্পের বই। লেখক কেবল লেখকই নহেন, চিত্রশিল্পীও বটেন। তাই লেখার মধ্যে সত্যিকারের উপভোগ করার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। গল্পগুলি যাদের জন্য রচিত তারা পড়ে যে খুবই খুশী হবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ছবি ছাপা বাঁধাই চমৎকার। আশা করি ছেলেদের অভিভাবকগণ এই বইখানার অনাদর করবেন না।

বাবমামা—শ্রীঅখিল নিয়োগী। প্রকাশক কুলজা সাহিত্য মন্দির, ৩০ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দাম ছয় আনা।

এই বড় গল্পট লেখক বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে লিখেছেন, স্থানে স্থানে ওস্তাদ শিল্পীর তুলির পোঁচও এতে দেখতে পাওয়া যায়। গল্পট পড়তে পড়তে ছেলেরা যে ভয়ে বিস্ময়ে কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকগুলি ছবিও এতে আছে, সুতরাং শিশুদের মনোরঞ্জনের দিকে প্রকাশকের এই চেষ্টা প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য।

অভিশাপ—শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী। পি-৮১ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে দি বুক ষ্টল কর্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

এই ছোট বইখানা বিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস "লাষ্ট ডে অফ পম্পিরাই" নামক বইয়ের শিশু-সংস্করণ। রচনায় লেখকের কৃতিত্ব সুস্পষ্ট। ভাষা মনোরম। খান কয়েক ছবি দিয়ে আরো মনোজ্ঞ করে তোলা হয়েছে।

মাধবীর বিদ্রোহ—শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য। যশোহর। মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

এ-খানা ঠিক উপন্যাস নয়, এতে চাকরি না করেও কেমন করে বাঙালী আজ জীবিকার্জ্জন করতে পারে তারই নির্দ্দেশ আছে। লেখকের ভাষা সরল, সহজ এবং বক্তব্য বেশ সুস্পষ্ট। তাঁর রচনার উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই দুর্দ্দিনে বাঙলার যুবকগণ যে এ বইখানা থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। এই বইখানা অনাদর লাভ করলে দুঃখের কথা হবে।

বাঁচিবার উপায়। শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য, যশোহর। মূল্য একটাকা।

কেমন করিয়া এই দৈন্য দুর্দ্দিনে বাঙলী বাঁচতে পারে এই বইখানায় তারই ইঙ্গিত রয়েছে এবং সে কার্য্যে গ্রন্থকার যথেষ্ট নিপুণতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি দেশবাসীকে স্বাবলম্বী হতে অনুরোধ করেছেন। এই সব দিকেও যে দেশের লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে তার প্রমাণ এই বই দুখানা। গ্রন্থকারের শ্রম সফল হলে আমরা খুশী হব।

নারী—শ্রীগঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৷০ টাকা।

ইহা একখানি কবিতার বই। লেখক একজন নাম-করা কবি, ইতিপূর্ব্বে তাঁর আরো খানকয়েক কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে গঙ্গাচরণ বাবু সাময়িক পত্রে রচনা প্রকাশ করেন না বলে তাঁর কবি-প্রসিদ্ধি অনেকের নিকটই অজানা রয়ে গেছে। এই বই-খানা পড়ে আমরা খুশী হয়েছি, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট। আশা করি কবিতা-প্রিয় বাঙালীর নিকট এর যথেষ্ট সমাদর হবে।

শিশুমহল—সচিত্র ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্র। সম্পাদক—মোহাম্মদ আফজাল-উল্ হক, মোসলেম

পাবলিশিং হাউস, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য চোদ্দ পয়সা। ভাদ্র মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। কাগজখানা যে ছেলেমেয়েদের আদর লাভ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছাপা কাগজ ছবি সবই শিশুদের মনোরঞ্জন করবে। আমরা এ পত্রের সাফল্য কামনা করছি। প

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক দৃশ্যকাব্য—মন্মথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য এক টাকা।

বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্য। শুধু গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ছাড়া বাঙলার সাহিত্য-প্রতিভা অন্য কোন পথে বিশেষ শক্তির পরিচয় আজো দিতে পারে নি। বাংলার কথা ও কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেখানে সংস্কার মুক্ত মন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে বঙ্কিমবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র হয়ে শৈলজানন্দ পর্য্যন্ত একটা যোগসূত্র পাওয়া বিশেষ কঠিন হয় না। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যে যে ক'টি প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত বিকশিত হয়েছে তারা প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন। অতীত থেকে কোন প্রেরণা তার পায় নি বা নেয় নি এবং ভবিষ্যৎকেও তারা কোন প্রেরণা দেয় নি। দীনবন্ধু মিত্র, গিরীশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র-সকলেই নাট্য সাহিত্যে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ কারো আত্মীয় নন। শরৎচন্দ্রের কথা বাদ দিয়ে বাকী সকলের সম্বন্ধেই বলা চলে যে, নাট্য-সাহিত্যে তাঁরা সাড়া তুলেছেন কিন্তু নাড়া দিতে পারেন নি। তাঁদের প্রতিভা আপনার মধ্যে আপনি সমাপ্ত। নাট্য-সাহিত্যের মুখ তাঁদের কারুর প্রেরণায় আজো খোলে নি। তাই পাদপ্রদীপের আলোক অযোগ্য অপটু হাতের বিসদৃশ সৃষ্টিকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

নাট্য-সাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীমন্মথ রায়ের কাছে আশা করা যেতে পারে। আসরে তিনি খুব অল্প দিনই নেমেছেন কিন্তু তাঁর লেখা এর মধ্যেই সুপরিচিত হয়েছে। তাঁর কলমের কাজ শুধু সূক্ষ্ম নয়, জোরালো ও রঙদার। ইবসেন, মেতারলিঙ্কের কাছে হয়ত তাঁর প্রথম দীক্ষা কিন্তু অনুকরণ ও অনুকরণের আভাষ তাঁর লেখায় নাই বল্লেই চলে। 'চাঁদ সদাগর'-এর ফরমাজী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে তাঁর কলম বোধ হয় ভাল করে খেলতে পায় নি। তা সত্বেও নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়।

চয়নিকা—কবিতার বই। লেখক শ্রীযোগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছাপা বাঁধাইর জন্য বেশ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু কবিতাগুলি নিরর্থক বাক্যযোজনা। যেমন সস্তা ভাব, আড়ষ্ট ভাষা, তেমনি পঙ্গু ছন্দ। মাকাল ফলের মত এর বাহ্য সৌষ্ঠবটুকুই আছে।

স্বাধীন বাঙলা—শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা প্রণীত। প্রকাশক বর্দ্ধন পাবলিশিং হাউস, মূল্য এক টাকা।

পশ্চিমের প্রভাবে আমাদের শুধু অতীতের জাতীয় ও মানসিক জীবন-ধারা থেকে বিচ্ছেদই হয় নি, সে সম্বন্ধে বিস্মৃতিও ঘটেছে। বাংলার ভাব ও কর্ম্মজীবনের যে বিশিষ্ট রূপ ছিল তা আমরা একেবারে ভুলেছিলাম। ধীরে ধীরে যে আমাদের বিরূপ মন আবার সে জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করছে, এটি আশার কথা।

'স্বাধীন বাঙলা' উগ্র রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের বই নয়, বাংলায় যে স্বাধীন বিশিষ্ট জাতি-সত্বা ছিল তার কিছু পরিচয় এ বইটিতে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ চেষ্টা সাধু।

সমাজ—প্রবন্ধসমষ্টি—৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রণীত। বর্দ্ধণ পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত; মূল্য দশ আনা।

৺ব্রহ্মবান্ধবের বিপুল চিন্তাশীলতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অসীম জ্ঞান বিদ্যা ও অসামান্য প্রতিভা সম্বন্ধে আর নতুন কি বলা যেতে পারে ভেবে পাই না। শুধু যাঁরা পড়েন নি তাঁরা নয় যাঁরা আগে এ লেখাগুলি পড়েছেন তাঁদেরও ফিরে পাঠ করা প্রয়োজন।

ঝরা পালক—কবিতার বই, শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত প্রণীত। দাম এক টাকা।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত কাব্য-সাহিত্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তরুণ কবির সমস্ত কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিত। তাঁর ছন্দ ভাষা ভাব সবেতেই বেশ বেগ আছে। ত্রুটি যা-কিছু আছে তা কখন কখন সেই বেগের অযথা আতিশয্য। নজরুল, মোহিতলালের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি বটে কিন্তু সে প্রভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যের পথে ফেরাতে পেরেছেন বলে মনে হয়। প্র

সে দিন বন্ধু বলিলেন, এ বৎসরের পঞ্জিকাতে বৎসরের ফলাফল গণনায় লেখা আছে—এ বৎসরে সমধিক সাহিত্য-আলোচনা হইবে। কথাটা সত্যই দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ ভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জ্জটি মুখোপাধ্যায়, কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ও সুধীবর্গ বর্ত্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতেছেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে হয় ত সকলেই কিছু না-কিছু অপ্রাসাঙ্গিক কথাও উল্লেখ করিতেছেন।

তবুও ইহা এ যুগের লোকসাধারণের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। অনেক দিন জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠদের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ কিছু বলেন নাই। যে কারণেই হউক বর্ত্তমান সময়ে এই আলোচনাটি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এবং সাহিত্য-সেবী ও সাধারণ পাঠকবর্গ ইহা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছেন। ইহা এ যুগের পক্ষে কল্যাণকর ও ও গৌরবের কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়ও কিছু আছে। এতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু সম্যক ভাবে তাহাতে কেবলমাত্র আধুনিক সাহিত্যের ধারা কিরূপ হওয়া উচিত বা কিরূপ হইতেছে, বর্ত্তমান সময়ের লেখক ও পাঠকের তাহা হইতে কতটা শিক্ষা ও সাহায্য হইতে পারে, সে সব কথা খুব কমই থাকে। এই আলোচনার শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার মানুষের মনে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহার কেহ মীমাংসা করিয়া দিতেছেন না। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে অনেককে আক্রমণ করা হইতেছে কিন্তু তাহাতে বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারার পরিবর্ত্তন ও প্রচলন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

———

সকল ভাল ভাল জিনিষের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গেই যেমন তাহার নিকৃষ্ট অনুকরণও কতকগুলি বাহির হয়, বর্ত্তমান আলোচনা ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে। তবে সুখের বিষয় তাহা অত্যন্ত কম এবং বিদ্বেষজাত। এগুলির সহিত ভদ্রসাধারণের কোনও যোগ বা সহানুভূতি নাই। পূজায় পার্ব্বনে যেমন কোনও কোনও স্থানে কীর্ত্তন, ভক্তি-রসাত্মক যাত্রা বা নির্দ্দোষ অভিনয়াদির আয়োজন হয় তেমনি কোনও কোনও পাড়ায় আবার দেবপূজা উপলক্ষ্য করিয়াই খিস্তি খেউর ও নানাবিধ নিন্দনীয় কার্য্যেরও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সমস্তই রুচিসাপেক্ষ। বর্ত্তমান আলোচনা-ক্ষেত্রেও তাহাই দেখা যাইতেছে। কাহারও উপর ঈর্ষা যখন মানুষকে পাইয়া বসে তখন তাহাতে ব্যক্তির চরিত্র ও দুর্ব্বলতাই বেশী প্রকাশ পায়। যাহার রুচি ভদ্রজনোচিত নহে, ভদ্র বেশ পরিয়া থাকিলেও বেশী কথা বলিতে গেলে ঐ ব্যক্তির কুরুচি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ জন্য কোনও বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তিও যদি ঐরূপ কুরুচির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন বা ঐ সকল কুরুচিতে আমোদ উপভোগ

করেন, অন্যান্য লোকের কাছে অন্তত ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মূল্য কমিয়া যায়।

———

বাঙলা দেশের জনসাধারণ আজ সাহিত্যক্ষেত্রে এই আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা চাহিতেছে—তাহা গালাগালি বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষজনিত আলোচনা নহে।—ব্যাপক ভাবে সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধেই উপযুক্ত উপদেশ ও আলোচনা চাহে।

———

পৃথিবীতে ব্যক্তির স্থান চিরকালই সময় সাপেক্ষ থাকে। যে ব্যক্তি এককালে বিশেষ কোনও কারণে প্রতিষ্ঠা বা যশ অর্জ্জন করে, পরে এক সময়ে সে ব্যক্তির যশ প্রতিভা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায় এরূপ দেখা গিয়াছে। এ পৃথিবীতে কোনও মানুষ চিরকালের জন্য অবিসম্বাদিত ভাবে লোকগুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার পরবর্ত্তী কেহ আসিয়া আবার তাহা হইতেও অধিক প্রতিষ্ঠা ও জনমনের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে।

বর্ত্তমান কালে যাঁহারা মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন পাইয়াছেন হয় ত তাঁহাদের মধ্যেই কাহাকেও কালের বিচারে অধিক প্রতিভাশালীর জন্য সে আসন হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। দেখা যাইতেছে, ইহা জানিয়াও অনেকে নিজ কার্য্যাবলীকে পৃথিবীর জন্য চরমদান ভাবিয়া অহঙ্কৃত থাকেন। সেই কারণে ইঁহাদের অন্য কাহারও প্রতিভার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিচার করিতেই দেখা যায়।

———

আর একটি বিশেষ বিবেচনার বিষয়। দুই একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধে এইরূপ দোষারোপ করিয়াছেন যে, দেশের কয়েকখানি তরুণগণ দ্বারা পরিচালিত মাসিক পত্রিকা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও দলের সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা গত কয়েক মাসের বিবিধ পত্রিকার আলোচনাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তরুণদের দ্বারা পরিচালিত কোনও পত্রিকাই কখনও কোনও বিশেষ দলের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করে নাই বা দলাদলি বাধাইবার কোনওরূপ চেষ্টা করে নাই। অনেকের হয় ত মনে থাকিতে পারে যখন উপর্য্যুপরি অযথা নিন্দাবাদ দ্বারা তাহাদের আঘাত করিবার চেষ্টা হইতেছিল তখনও দেশের কোনও তরুণই তাহার বিপক্ষকে একটি কথা বলিয়া দলাদলি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে নাই। দল গড়িয়া উঠিতেছে অন্যের চেষ্টায় এবং তাহারা কাহারা ও কি ভাবে সে অভিসন্ধি পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে তাহাও দেশের লোক লক্ষ্য করিয়াছে। একদল লোককে কেবলই যদি নানা ভাবে ও পন্থায় গালাগালি দেওয়া হয় তাহা হইলে আপনা হইতেই যে দলাদলি সৃষ্টির সম্ভাবনা হয় তাহা বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তরুণদলকে এ জন্য দায়ী করা অনর্থক ও অবিচার।

———

যাহারা যশাকাঙ্খী নয়, নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের নানাদিক দিয়া সেবায় ব্রতী থাকে তাহারা এই তরুণ ও তরুণীর দল। ইহারা অখ্যাত এবং নিজ প্রাণের প্রেরণায় সকল হিতকর কার্য্যে নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত দান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই সকল সরল স্বভাবকর্ম্মী তরুণ ও তরুণীদের যাঁহারা কটূক্তি ও নীচ ব্যবহার দ্বারা অপদস্থ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা তরুণ বা প্রবীণ যেই হউন, দেশের মঙ্গল তাঁহারা চান না তাহা বেশ বুঝা যায়।

আলস্য ও পরের কৃপায় জীবনধারণ করিয়া যাহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যশপ্রার্থী হইয়া এই সকল অসঙ্গত কার্য্য করিতেছে তাহাদের স্বরূপ আজও প্রকাশ না পাইয়া থাকিলেও শীঘ্রই যে দেশের লোকের বিচারে তাহা ধরা পড়িবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বলিয়াই তাহাদের বিষয় আর উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয় না। আলোচনার ভিতরও একটা সৌন্দর্য্য ও ভদ্রতার সীমা আছে কিন্তু তাহার বাহিরে যাইয়া অভদ্র আচরণের পরিবর্ত্তে অভদ্র আচরণ করা অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারেই শোভন নহে। আর বিশেষ যাহারা আত্মসম্মান ও আদর্শের প্রতি আস্থা রাখে তাহাদের পক্ষে ত আত্মবিস্মৃত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

———

ক্লীব যাহারা, যাহারা নিজে কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহারা যখন পরের কার্ড লইয়া বিচারের দণ্ড হাতে

লইয়া আস্ফালন করে তখন সে দৃশ্য অভিনয়ের মতই হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হয়। বাঙলা দেশের তরুণ ও তরুণীরা নিতান্ত ক্ষমাশীল ও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত, নচেৎ হয় ত সুবুদ্ধির মত এই সকল প্রহসনের কদর্য্যতাকে হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া তাহারা ঐ সকল কার্য্যেরই উপযুক্ত অন্য কোনও উপায় দ্বারা সাহিত্যিক গুণ্ডার অত্যাচার থামাইয়া দিত। সুখের বিষয়, দেশের তরুণ ও তরুণীরা এই গুণ্ডা বহিষ্করণ আইন প্রচলনের ভার দেশের লোকের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত রহিয়াছে।

———

আমাদের গুরুস্থানীয় যাঁহারা তাঁহাদেরও কাহারও কাহারও লেখার ভিতর অনেক স্থানে সংযমের অভাব লক্ষিত হয়। ইহা দুঃখের বিষয়। দেশের লোক তাহা লক্ষ্য করিয়াছে এবং নিজেদের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া নিজেরাই মর্ম্মাহত ও লজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহাদের কাছে শিক্ষা পাইবার কথা তাঁহাদের কাহারও লেখার কোনও অংশ পড়িয়া যদি ভাষা বা মতের জন্য লোকের বিস্মিত হইতে হয় তাহা হইলে তাহা দেশেরই দুর্ভাগ্য।

———

বিশেষ, ভাষার উপর যাঁহাদের একচ্ছত্র অধিকার, কথার ফাঁদ বুনিয়া যাঁহারা একটি সামান্য কথাকে বহু পল্লব-শাখায় বিস্তৃত ও দীর্ঘ করিয়া ফেলিতে পারেন লোকে তাঁহাদের কথার যাদুকর বলিয়াই জানে। তাঁহাদের মধ্যেই কেহ যদি কোনও কথা বা মত প্রকাশ করিতে যাইয়া অসঙ্গত ও অশোভন ভাষা ব্যবহার করেন তাহা হইলে অনুমান করা যায়, চাটুকারবর্গের বিষশলাকা তাঁহাদের হৃদয় পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়াছে। তাহা না হইলে ইঁহাদের মত পণ্ডিত ও হৃদয়বান্ ব্যক্তিরা পক্ষে এরূপ হৃদয়হীন নির্ম্মম হওয়া সম্ভব হইত না বলিয়াই সাধারণের ধারণা।

———

যাহা হউক, এরূপ অসঙ্গত আলোচনায় যে সাহিত্যের কি সুফল ফলিবে তাহা ভাবিয়া লাভ নাই। একবার যাহারা একটা কাজ করিতেছে বলিয়া মাতিয়াছে তাহাদের কোন সুযুক্তি দ্বারা নিরস্ত করা সম্ভব নহে। যাহারা মন্ত্রণায় সিদ্ধহস্ত, কার্য্যসিদ্ধির জন্য সকল কিছু করিতে পারে তাহারা যখন বড়দের পর্য্যন্ত এই ছত্রভঙ্গ কার্য্যে নামাইয়াছে তখন তাহারা তাহাদের ক্ষমতার একটা শেষ ফল না দেখিয়া ছাড়িবে না ইহা ত জানা কথা। কিন্তু ফলে বাঙলা সাহিত্যের কতটুকু উন্নতি হইবে অনুমান করিতে পারিলেও এখনও তাহা দেখিবার বিষয় রহিল।

———

বর্ত্তমান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় একজন। ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদকে খণ্ডন করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বোধ হয় ইহাই কবির শেষ লেখা।

কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের 'একতারা' বলিয়া কবিতার বহিখানি বঙ্গবাণীর আদরের সামগ্রী হইয়া চিরকাল থাকিবে। ইনি রবীন্দ্রভক্তগণের মধ্যে একজন আসল ভক্ত ছিলেন। ইঁহার নিজের প্রতিভাই ইঁহার যশ প্রতিভাকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। ইনি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের নিকটআত্মীয়। ইনি প্রবন্ধ রচনায়ও বিশেষ সংযম ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যৌবনকাল হইতেই ইনি মাসিকপত্রিকাদিতে লিখিয়া আসিতেছেন। মাত্র কয়েকদিন হইল বিষাক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাঙলা তাহার একটি ধীর, স্থির ও প্রাজ্ঞ সাহিত্যসেবীকে হারাইয়া যথার্থই বিশেষরূপে বঞ্চিত হইল।

———

গত রবিবার ২৭শে কার্ত্তিক কবি চণ্ডীচরণ মিত্র মহাশয়ের আমন্ত্রণে আমরা তাঁহাদের বেলঘরিয়া 'মিলনে' পত্রিকার বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। 'মিলনে' পত্রিকাখানি হাতের লেখা মাসিক কাগজ। প্রায় তিন বৎসরাবধি এই পত্রিকাখানি গ্রামস্থ তরুণগণের চেষ্টায় ও যত্নে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা, গল্প ও চিত্রশিল্পের জন্য একটি করিয়া রৌপ্যপদক এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

রায় জলধর সেন বাহাদুর এই মিলনোৎসবের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গ্রামস্থ ও কলিকাতা হইতে বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সরকারী দাদা জলধর সেন মহাশয় বক্তৃতা প্রদান কালে সকলকে যৌবনেরই সাধনা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেও আজও প্রাণে প্রাণে যৌবনেরই সাধনা করেন।

তিনি বলেন, আজ যাঁহারা তরুণকে অভিশাপ দিতেছেন, অপদস্থ করিতেছেন তাহারা জানেন না যে, শিক্ষায় দীক্ষায় বহুকালের যত্নে ইঁহারা যে বিষয়টি শিক্ষা করিয়াছেন, আজকালকার তরুণ তাহাই তিন বৎসরে সমাধা ও আয়ত্ত করিয়া লয়।

আমরা এইরূপ অনুষ্ঠানের উপকারিতা অনুভব করি। প্রত্যেক গ্রামেই যদি এইরূপ হাতের লেখা পত্রিকা থাকে তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সকল সাহিত্যের যেমন চর্চ্চা হয় তেমন অন্য সকল গ্রামহিতকর কার্য্যেও এই অনুষ্ঠান হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। আমাদের মতে এইরূপ পত্রিকাদিতে বিশেষ করিয়া নিজ গ্রামের কাহিনী, লোক-জীবনী, গাথা, গান ও ইতিহাস লইয়াই আলোচনা বেশী থাকা উচিত।

আমরা জানি, বাঙলা দেশে এরূপ বহু হাতের লেখা পত্রিকা আছে। অনেকগুলি আমরা নিজে দেখিয়াছি। চিত্রশোভায়, লেখা সম্বন্ধে এই পত্রিকাগুলি অতিশয় মনোরম ও প্রাণস্পর্শী হয়। এই সকল অনুষ্ঠানগুলিকে আমরা আমাদের অন্তরের সহানুভূতি ও প্রীতি জানাইতেছি।

চণ্ডীদাস

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম্মাবসানের পর হিন্দু-পুনরুত্থান যুগের আরম্ভ হয়। এই সময়ে সেন-রাজগণের চেষ্টায় বঙ্গদেশে আবার বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতেছিল। শঙ্করের দার্শনিক মতবাদ বৌদ্ধদার্শনিক মতবাদের উপর যতই আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, দেশের আপামর সাধারণ ততই বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্য উপাসনার উপর আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। কর্ম্ম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যে কর্ম্মহীনতার দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছিল, তথায় তাহারা ধরিবার মত কিছুই পাইতেছিল না। বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রতিষ্ঠিত মঠ ও বিহারগুলি ব্যাভিচারের লীলানিকেতন হইয়া পড়িতেছিল। সাধারণের অনুষ্ঠেয় প্রাণ-মাতানো ক্রিয়াকর্ম্মের অভাবে শূন্যবাদ মহাশূন্যের মতই প্রতীয়মান হইতেছিল। কাজেই নিরীশ্বরবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম আর মানুষের প্রাণে তৃপ্তি দিতে পরিতেছিল না। মানুষ এক ঐশীশক্তিবিমণ্ডিত মানব-গুণসম্পন্ন প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ দেবতার পূজা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় সে শৈবধর্ম্মের সাক্ষাৎ পাইল। সে দেখিল—পৌরাণিক শিব আশুতোষ, পরমযোগী অথচ ভক্তবৎসল। তিনি তাহারই মত স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করেন। পতিব্রতা সাধ্বী সতী তাঁহার গৃহলক্ষ্মী, কুবের তাঁহার ধন-ভাণ্ডারী, অথচ তিনি নিজে কোন ঐশ্বর্য্যের ধারই ধারেন না। সতী শুধু সতী নন, তিনি রাজকুমারী হইয়াও

শ্মশানবাসী স্বামীর সেবা করেন, স্বহস্তে অন্ন রাঁধিয়া স্বামী-পুত্রকে খাওয়ান, আবার পতিনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগও করেন। শুধু সতীই যে পতিনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করেন তাহা নহে, পতি শিবও আবার সেই দেহ স্কন্ধে করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য পরিভ্রমণ করেন। এই পতিপ্রাণা সতী এবং সতীপ্রাণ মহাদেব সহজেই গার্হস্থ্যধর্ম্মানুরাগী বাঙালীর মন, প্রাণ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সতী এবং আশুতোষকে লইয়া বাঙালী নর-নারীর কত কল্পনা, কত সাধনা, কত বেদনা, স্তোত্রে, কাব্যে, গাথায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু আবর্ত্তনশীল কালের প্রভাবে কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। যে যে দোষে বাঙলার বুক হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল, সেই সেই দোষে শৈবধর্ম্ম দূষিত হইল—তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রচলনে মদ্য, মাংস ও ব্যভিচার শৈবধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইল। বাঙালী আবার নিরাশ হইয়া শৈবধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইতে বসিল। এই সময়ে জয়দেব তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর্গীয় ছন্দে সুমধুর রাধাকৃষ্ণলীলার গীতগোবিন্দ গাহিয়া উঠিলেন। সে অতুলনীয় গান, সে সুরধারা তখন বাঙালীর প্রাণ ভাল করিয়া স্পর্শ করিল না। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সুরের রেশ টানিয়া অপূর্ব্ব ছন্দলালিত্যে শাক্ত কবি চণ্ডীদাস ও শৈব কবি বিদ্যাপতি তাঁহাদের মোহনবংশী বাজাইয়া উঠিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের নীরস শূন্যবাদ বা শঙ্কর প্রবর্ত্তিত শুষ্ক বৈদিক মত যাহার সন্ধান দিতে পারিতেছিল না, বাঙালীর প্রাণ সেই শাশ্বত রসের সন্ধান পাইল। বাঙলা গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদদাতা এই শাক্ত চণ্ডীদাসই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বীরভূম জেলার শাকুলীপুর থানার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকাল এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই; তবে অনেকেই অনুমান করেন তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ও চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এ সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। চণ্ডীদাসের বংশ-পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল এই মাত্র জানা গিয়াছে যে, তাঁহার পিতা বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন এবং এই জন্যই পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখিয়াছিলেন। বাল্যাবস্থায় চণ্ডীদাসের পিতামাতার মৃত্যু হয় তজ্জন্য তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ ঘটে নাই। উপনয়নের পরেই তিনি পিতৃস্থলাভিষিক্ত হইয়া বাশুলী দেবীর পূজক নিযুক্ত হন্। রজককন্যা রামী বা রামমণি এই বাশুলী দেবীর মন্দির মার্জ্জনা করিত। চণ্ডীদাস তাহারই প্রেমে পড়িলেন। এ প্রেম যে-সে প্রেম নয়। এ প্রেমে মর-জগতের পঙ্কিলতার দুর্গন্ধ নাই, ইহা নন্দনকাননের পারিজাত গন্ধে সুবাসিত। এই রজককন্যা চণ্ডীদাসের সাধন ভজন, নয়নের তারা, গলার হার, কবিত্বের প্রস্রবণ, প্রেমের গুরু। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

'তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥'

এই রামমণিই তাহাকে সত্য, সফল ও সার্থক করিয়াছে। অনুভূতি দ্বারা সত্যকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে কোন কবিই অপূর্ব্ব সুন্দর পদ রচনা করিতে পারে না, চণ্ডীদাস নিজের সমস্ত সত্ত্বা দিয়া বিরহের মর্ম্ম-ব্যথা, কলঙ্কের জ্বালা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই রামীর বিরহের দুঃখ, মিলনের আনন্দ, অদর্শনের ব্যাকুলতা, প্রেমের সার্থকতা তাঁহার হাতে এরূপ রঙীন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ—সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া তিনি রামীকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কাব্য রাধা ভাবে ভাবময়, তাই তাঁহার কাব্য ত্যাগের এরূপ অপরূপ সুষমায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে,
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
মন প্রাণ দিয়া সব সমর্পিয়া,
নিশ্চয় হইনু দাসী॥

* * *

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ, মন আদি, তোহারে সঁপেছি কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপগোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্যসম তোমার চরণ মানি॥

ইহা শুধু ত্যাগের গীতি নয়, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্ত-হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস! বস্তুতঃ ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিলে উক্তপদদ্বয় ধর্ম্মবেদী হইতে উচ্চারিত স্তোত্রের মতই শুনায়।

স্বাভাবিক সহজভাবে চণ্ডীদাস রামমণিতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ অনুরাগে জাতি, কুল মানের ভয় কাহারও কোন কালে থাকে না; চণ্ডীদাসেরও ছিল না। রূপের ঘোরে, যৌবনের মোহে, ইন্দ্রিয়বিকারে এখনও কত লোক এমন করিয়া জাতি, কুল, মান ভুলিতেছে দেখা যায়। তবে যেখানে এই অনুরাগ আসক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া প্রেমে পরিণত হয়, সেখানে এই প্রেম সমস্ত আবিলতা হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গদ্বারে লইয়া যায়। চণ্ডীদাসের জীবনেও প্রেমের এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে। এই প্রেমেই তাঁহার জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল, তাই তিনি কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিতে পারিলেন—

মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের প্রচেষ্টায় চণ্ডীদাসের কতকগুলি নূতন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জীবন-বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। রজকিনীর কলঙ্ক হেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত হন। তাঁহার ভ্রাতা নকুল তাঁহাকে সমাজে উঠাইবার চেষ্টা করেন। চণ্ডীদাসের ইহাতে বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না কিন্তু অবশেষে নকুলের অনুরোধে তিনি স্বীকৃত হইলেন। তিনি স্বীকার করিলেই যে সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল তাহা নহে। গ্রামবাসী মনু, পরাশরের বংশধরেরা আপত্তি তুলিলেন, চণ্ডীদাস 'নীচপ্রেমে উন্মাদ' এবং তাঁহাদের 'পুত্র পরিবার, আছয়ে সংসার'; অতএব তাঁহারা চণ্ডীদাসের হাতের অন্ন, ব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, নকুল তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে চণ্ডীদাসের জন্য অনুনয় বিনয় করিয়া সম্মতি লইয়া আসিলেন।

এ দিকে এ কথা শুনিয়া রামী 'নয়নের জলে, কান্দিয়া বিকল, মনে বোধ দিতে নারে' এবং 'গৃহকে জাইঞা, পালঙ্ক পাড়িয়া শয়ন করিল তায়।' কিন্তু তাহাতেও শান্তি পাইল না, যেখানে চণ্ডীদাস ভোজনরত ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন, উন্মাদিনীর ন্যায় সেখানে ছুটিয়া গিয়া কাঁদিতে লাগিল। দীনেশবাবু বলেন, 'এই বর্ণনা দ্বারা যে অনর্থোৎপাতের সূচনা হইয়া রহিল, তাহার শেষাঙ্ক জানা গেল না, পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।' তবে ইহা বোধ হয় অনুমান করা শক্ত নয় যে, চণ্ডীদাসের কলঙ্কোপনোদন হইল না। তিনি কৌস্তভমণির সন্ধান পাইয়াছিলেন, নকল হীরার চাকচিক্যে তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিবে কেন? তাই তিনি রামীর জন্য চির-কলঙ্কী হইয়া রহিলেন।

'কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥'

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, চণ্ডীদাস লেখাপড়া জানিতেন না, রামীকে ভালবাসিয়াই প্রেমের গীতি-কবিতা রচনা করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমান ভিত্তিহীন। মনোযোগের সহিত চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিলে, যে সকল আভ্যন্তরিক প্রমাণ (internal evidence) পাওয়া যায়, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি ভাগবতগ্রন্থের সহিত সুপরিচিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, যুগলরূপ বর্ণনা কুঞ্জরমিলন প্রভৃতি পদে যে সকল শব্দবিন্যাস দেখা যায় তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। ইহা সম্ভবপর হইতে পারে যে, 'পাগল চণ্ডীদাস' বা 'পাগলা চণ্ডে' হইতেই পরবর্ত্তীযুগের লোকে তাহাকে মূর্খ কল্পনা করিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। নিমাই যখন প্রেমে বিভোর হইয়া সাধনার মধুরবাণী প্রচার করিলেন তখন লোকে তাঁহাকে পাগল সাব্যস্ত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মহাজন দর্শিত সনাতন পথ ছাড়িয়া যে-কেহ অকুতোভয়ে জ্ঞানের, প্রেমের সাধনার নব নব তথ্য প্রচার করে, সে-ই পাগল হইয়া দাঁড়ায়। চণ্ডীদাস ত কেবল 'পাগল' আখ্যা লাভ করিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন কিন্তু এই স্বমতানুবর্ত্তিতার জন্য সক্রেটিসকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস রামীর প্রেমে মজিয়া পরমপ্রেমের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সাধারণে এ প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। তাই তিনি বলিয়াছেন—

রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কবে অপযশ।
ধরম করম লোক চরচাতে,
এ কথা বুঝিতে নারে।

সকলেই বোধ হয় এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, পদাবলী-সাহিত্যে চণ্ডীদাস একচ্ছত্রী সম্রাট। এই পদাবলী সাহিত্যেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব। সত্য বটে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই, কিন্তু উপমা বাহুল্যবর্জ্জিত হইলেও তাঁহার কবিতায় এই সত্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে যে, অলঙ্কার হইতে সুন্দরের স্বভাবভঙ্গীই বেশী চিত্তাকর্ষক। চণ্ডীদাসের পদাবলী ভাব-মাধুর্য্যে এত সম্পদশালী যে জগতের যে-কোন গীতি-কবিতার সহিত তাহার তুলনা করা চলে। জগতের প্রেম-সাহিত্যে এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী দিব্যপ্রেমবিমণ্ডিত গীতি কবিতা অতি বিরল। চণ্ডীদাস এরূপ সহজ, সরল ভাষায় প্রেমের চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন যে, এমন হৃদয়হীন কঠোর শুষ্কপ্রাণ কেহ থাকিতে পারে না যাহার প্রাণ ইহাতে মুগ্ধ ও বিগলিত না হয়।

নায়কের পূর্ব্বরাগের পদে সৌন্দর্য্য বর্ণনা এরূপ উজ্জ্বল হইয়াছে যে, পদাবলী-সাহিত্যে তাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

তড়িত বরণী হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন্ বা রাজে ॥

* * *

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী,
চকিত চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
তভই উদয় ভেল ॥

* * *

একে যে সুন্দরী কনক পুতুলী,
খঞ্জন লোচন তার।
বদন-কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে
তিমির কেশের ধার ॥

* * *

থির বিজুরী বদন গৌরী,
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছাঁদে করবী বাঁধে
নবমল্লিকার মালে ॥

রাধার পূর্ব্বরাগের পদ, বর্ণনা ও ভাব-বৈচিত্র্যে চণ্ডীদাসের কবিতা প্রকাশ ভঙ্গিমায় নিখুঁত—অপরূপ—

জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥

* * *

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজ-কুল-নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে॥

* * *

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

* * *

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥

* * *

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥

* * *

সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা, মুখ বনাইল রে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥

বদন থাকিতে না পারি বলিতে,
তেঁই সে অবলা নাম।

* * *

মরিয়া হইব শ্রীনন্দনন্দন,
তোমারে করিব রাধা।

* * *

আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

* * *

এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥

* * *

চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি,
পরাণ সহিত মোর।

চণ্ডীদাসের রাধা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। জয়দেবের রাধা কৃষ্ণকে—'মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারম্'—বলিতে বাধ্য করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রাধার জন্য কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে—

করকমল পরশইতে চাহি, বিহি নহে যদি বামা।
তোঁহার চরণে, শরণ লইনু সদয় হোয়া রামা॥

* * *

পরশইতে চরণ সাহস না হোয়।
করযোড়ি, ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার মান করিবারও সাধ্য নাই—

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আনপথে ধাই তবু, কানুপথে যায়॥

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম নাহি লব, লয় তাঁর নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাশা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্ রহু এ সব ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

শুধু ইহাই নয়; আবার—

'যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়।'

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। পূর্ব্বরাগের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, নায়িকা রাধানাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে-ছেন। এ নাম সাধারণ নাম নয়, এ নাম বদন ছাড়িতে পারে না এবং জপিতে জপিতে শরীর অবশ হইয়া যায়। সাধারণ সম্ভোগলালসাপূর্ণ প্রেমে এরূপ নাম জপের দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। পরে সখীর উক্তিতে আমরা জানিতে পারি কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত রাধিকার আহারে বিরতি ঘটিয়াছে, তিনি যোগিনীর ন্যায় রাঙ্গাবাস অর্থাৎ গৈরিকবস্ত্র পরিয়া আছেন—যেন আত্মভোলা সন্ন্যাসিনী। বিদ্যাপতির পূর্ব্ব-রাগের রাধিকার 'সাঙন ঘন সম ঝুনয়ান' ঝুরিলেও কিন্তু 'ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে অনুসরহ'! বিদ্যাপতির এই চিত্রে যেন স্ফুটনোন্মুখযৌবনা রাধিকার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সেই পূর্ব্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিতে যাইয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্ত্তিটি দেখাইয়া-ছেন, তাহা আমাদিগকে আকুলিতকুন্তলা কোন প্রেমাস্পদার কথা মনে না করাইয়া দিয়া এ জগৎ হইতে বহু উর্দ্ধে এক অধ্যাত্মরাজ্যে লইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে যদি বলা যায় যে, এই আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভর করিয়াই বৈষ্ণব সাধকেরা পরমাত্মার প্রতি মানবাত্মার আকর্ষণ দেখাইবার জন্য রাধার রূপক প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ অন্যায় হইবে না। তবে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—এত জিনিষ থাকিতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিবার জন্য রাধার রূপক অবলম্বনীয় হইল কেন। ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভক্তিমার্গে ঈশ্বর-সাধনার যত প্রকার প্রণালী আছে, তন্মধ্যে মধুর-ভাবাত্মক উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সত্যের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। St. Juan এর উক্তিতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই—I will draw near to thee in silence and will uncover thy feet, that it may please thee to unite me to thyself. Make myself thy bride, I will rejoice in nothing till I am in thy arms. খৃষ্টীয় সমাজে অনেক ভক্তিমতী নারী নিজেকে খৃষ্টের বধূরূপে কল্পনা করিয়া ভক্তিসাধন করিতেন। এই মধুর ভাবের ভিতরে শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি পঞ্চ প্রকার ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। এই পঞ্চগুণ লাভ হইলে তবে মধুর রস-সাধনার দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়। মধুর রসের উপাসক এই সকল ভাবে পূর্ণ হইয়া শ্রীভগবানকে পতিস্বরূপ এবং নিজেকে প্রথমে শ্রীরাধার অনুগতা সখী এবং পরে সাধনমার্গে অগ্রসর হইলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধা কল্পনা করিয়া সাধনকরিয়া থাকেন। এই ভাব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, কোন অংশেই শারীরিক নহে। বৈষ্ণব সাধক নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়াছেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোনও স্থলে এরূপ দৃষ্ট হয় না। ভগবানকে পতিজ্ঞান করিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবা করা বড় সহজ কাজ নহে। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিত Newman-এর মতোদ্ধার করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তিনি বলিয়াছেন—If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a woman; yes, however manly thou mayst be among men.

চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধীয় ঘটনাটিও কিংবদন্তীমূলক। কথিত আছে, চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের দ্বারায় অবরুদ্ধ হইয়া

তাঁহার রাজধানীতে কীর্ত্তন গাহিবার জন্য গমন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় নবাবের বেগমসাহেবা চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব সুরলালিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমাসক্ত হন। নবাব অশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়াও বেগমকে শাসন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া চণ্ডীদাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, এই নবাবই পরে বাশুলী-দেবীর মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন।

এই নবাব কে, তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দীনেশবাবুর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—বাংলার ইতিহাসলক্ষ্মী যদি এই সম্রাটের নামটি একবার বলিয়া দেন, তবে আমরা তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পঞ্চগব্যে শোধন করিয়া গৃহে স্থান দিব।

ভ্রম সংশোধন : গত আশ্বিন মাসের কল্লোলে "দেবতা কোথায়" কবিতার লেখিকার নাম শ্রীচামেলীপ্রভা দেবীর স্থানে শ্রীচামেলীপ্রভা ঘোষ হইবে।

দূরের বন্ধু

(গান)

আব্দুল কাদের

বিদেশী বন্ধুয়া রে
ও তোর আসার আশায় জাগ্যা কাটাই, আক্ষে নাই নিন্দুয়া রে ॥

ও তোর স্বপ্নে দেখ্যা চরণ দুটী
চম্‌ক্যা চমক্যা জাগ্যা উঠি রে ;—
চক্ষের জলে বক্ষ ভাস্যে
ভিজ্যা যায় পিন্ধুয়া রে ॥

আন্ধ্যার রাতে বাইরে কালার
নূপুর রুণুর ঝুন্
শুন্যা মনের জ্বল্যা ওঠে
নিবা'ল্ সে আগুন রে ।

ও তোর আওলা কেশের বাউরি বাতাস
ঝুর্যা আনে সুবাস রে ;—
দুক্ষের ভরে ভাঙ্গা পড়ে
চিত্তেরই চান্দুয়া রে ॥

আক্ষে = চোখে, নিন্দুয়া = ঘুম, পিন্ধুয়া = বসন, আন্ধ্যার = আঁধার, নিবা'ল্ = নিবানো, আওলা = এলো, বাউরি = চঞ্চল, দুক্ষের = দুখের ।

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane, and Printed by K. Lahiri, at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rozio Lane, Calcutta.

কল্লোল

পৌষ, ১৩৩৪

সেল্‌মা লেগারলফ্‌

Mohan Press, Calcutta.

রমা

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

সাগর-মন্থন-দিনে বিক্ষোভিতসিন্ধুবক্ষ-তলে,
সুরাসুর-বাসনার বিহসিত শ্বেতাম্বুজ-দলে,
আরক্তপল্লব-পদ সমর্পিলে কবে ?
আজি ভাগ্য-নভে,
করাল-প্রলয়ঘন ছেয়ে যায় বিস্তৃত আঁধার।
দারিদ্র্যের বিভীষিকা, আতুরের আর্ত্ত হাহাকার,
অজস্র শোণিতপ্লাবী লৌহ বাহু নবসভ্যতার
আস্ফালন-মন্থনের রক্ত-মহোৎসবে,
অয়ি রমা, দাঁড়াইবে জীবনের ক্ষতের আহবে
শান্ত স্মিত মুখে,
প্রলুব্ধ, রয়েছি বসি' দিন গণি' স্পন্দমান বুকে।

চঞ্চলা, আজিকে তব অঞ্চলের ছায়াস্পর্শখানি
কোথায় মিলায়ে গেছে পাণ্ডু রৌদ্রে আপনায় টানি'।
জীবনের স্তরে স্তরে রেখে গেছে তা'র
অভাব-ধিক্কার।
চেষ্টা তবু র'য়ে গেছে, প্রাণপণ ভীষণ প্রয়াস ;—
ক্ষুধার সংগ্রামে তা'র পলে পলে হ'ল সর্ব্বনাশ।
মরণ-সাগর মাঝে বেদনার ফেনিল উচ্ছ্বাস
আঘাতে আঘাতে তবু শেষ নাহি হয়।
ফিরে ফিরে আসে জানি। রোগশোকনিন্দাগ্লানিময়
মৃত্যুশীর্ণ ভবে,
অয়ি রমা, দাঁড়াইবে জরা-ক্ষয়-ক্ষীণতায় কবে ?

স্বর্ণগর্ভা ধরিত্রীর স্নেহশ্যাম কুঞ্জবনচ্ছায়ে,
হে ক্ষণিকা, ধীরে ধীরে আপনারে দিয়েছ বিলায়ে !
হিরণ্য অঞ্চলটিরে ঢুলাইছ হাসি';
পুষ্প রাশি রাশি
অমনি উঠিছে ফুটি' প্রাচুর্য্যের নব আয়োজনে ;
বিমুক্ত ভাণ্ডার দ্বার। লক্ষ প্রাণী আনন্দ-প্রাঙ্গণে
ছুটিছে ব্যাকুল বেগে—দিশাহারা প্রাণ সন্ধিক্ষণে
মহান কল্যাণবাণী উচ্চারিছে ধীরে,—
পরক্ষণে হেরি সবে নতনেত্রে ভাসে অশ্রুনীরে।
—ক্রন্দন-কল্লোল,
দিগন্ত রণিয়া উঠে ; ধ্বনি' উঠে বেদনার রোল !

বিচিত্রা, আজিকে তব নানারূপে পেয়েছি সন্ধান ;
হিরণ্ময় প্রেমপাত্র প্রেয়সীর চিরমধুমান্—
স্পর্শ রাখে রোগতপ্ত ললাটের 'পরে,
কত স্নেহ ভরে !
জননীর শান্ত নেত্রে হেরিয়াছি তোমার প্রকাশ।
পেয়েছি বেদনাক্ষতে প্রলেপের সুস্নিগ্ধ আভাস।
নারীর কোমল বক্ষে বাঁধিয়াছ মৌন সুপ্ত বাস—
পালনের সুধা বহ' দিগ-দিগন্তর।
কমলা, তোমার স্পর্শে শ্যামশষ্পে ভরিছে প্রান্তর।

... এ বিশ্বের অমা,
ভবিষ্য-সাগর-মন্থে নাশি' কবে দাঁড়াইবে রমা ?

———

ব্যতিক্রম

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শহর হইতে খবর আসিয়াছে—

মুসলমানেরা বলে, "ইষ্টিশানে শিখ নেমেছে একদল। এয়া বড় বড় পাঞ্জাবী জোয়ান্! দেবে ঘর-দোর জ্বালিয়ে তছ্‌নাচ্ ক'রে'।"

হিঁদুরা বলাবলি করে, "শিখ্ নয়—শিখ্ নয়—দাড়ি আছে। ডাঁহা মোছলমান। বলে,—সব নাকি জবাই ক'রে ছেড়ে দেবে।"

... কথাটা উড়িয়া আসে নাই।

রেল-ষ্টেশনে হরিভূষণের হোটেল চলে। পুরা একটি বছর ধরিয়া ঘর আর ষ্টেশন তার এক হইয়া গেছে। এ-বেলা যায়, আর ও-বেলা আসে। তাহার-আনা খবর কখনও মিথ্যা হয় না।

ওদিকে রোসেদ্ মিঞার চুড়ির কারবার। মাল ফুরাইয়াছে কি অমনি তাহাকে বাজার ছুটিতে হয়। ষ্টেশনেই বাজার। সেও আজ সেইখান হইতেই খবর আনিয়াছে।

... সুতরাং জনরব সত্য।

গাঁয়ের লোক সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে। বলে,

"সকাল-সকাল খেয়ে সব—ঘরে খিল দাও।"

খিল যাহাদের আছে তাহারা দেয়; যাহাদের নাই, কথাটাকে তাহারা বিশ্বাস করে না।

কিন্তু তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিল!

গোষ্ট মালির না আছে খিল, না আছে কপাট,—তবু সে বিশ্বাস করিল।

না করিয়া উপায় কি?

সুমুখের পাঁচিরটা যদি বা ছিল, বর্ষার জলে তাও আবার পড়িয়া গেছে। ঘরের আব্রু এখন তাহার পথে।

পথ হইতে গৃহাভ্যন্তরের তুচ্ছতম বস্তুটিও নজরে পড়ে। অথচ দেখে সবাই সমান। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ সবার চোখের সুমুখেই লজ্জায় জড়সড় হইয়া যেন হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে।—তা সে শিখই আসুক আর মোছলমানই আসুক!

দরিদ্র পরিবারের দুর্ব্বলতম আশ্রয়টি গোষ্টর চোখের সুমুখে হঠাৎ যেন তার সমস্ত দীনতা দৈন্য লইয়া দাঁত বাহির করিয়া প্রকট হইয়া ওঠে।

ছেলেটা কখন্ বাহির হইয়া গেছে ... কোথায় গিয়াছে কে জানে!

মাঠ-বেড়ানো ঠ্যাঙ্গাটা হাতে লইয়া ছেলের খোঁজে গোষ্ট পথে বাহির হইল।

কিন্তু ছেলে কোথাও যায় নাই—

তাহারই ঘরের কাছে, শশী কুণ্ডুর সার-ডোবার পেছনে গর্ত্তের মত একটা জায়গায় বর্ষার জল খানিকটা জমা হইয়াছিল। সেই জলের মধ্যে অসংখ্য ব্যাঙের মাঝখানে পাড়ার একটা ছেলে হঠাৎ সেদিন কেমন করিয়া না জানি আঙুলের মত সরু একটি মাছ দেখিতে পায়। আরও কয়েকটা ছেলেকে সঙ্গে লইয়া তাহারা সকলে মিলিয়া সেই জলে গিয়া নামে, এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া সেই মাছটিকে ধরিবার জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা চলিতে থাকে। গোষ্ট মালির পাঁচ বছরের ন্যাংটা ছেলেটাও সেই সঙ্গে ছিল। তাহার নজরে যখন পড়িল, দেখে—ছেলে তখন সর্ব্বাঙ্গে কাদামাটি মাখিয়া ভূত সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গোষ্ট না চাহিল বাট্—দৌড়িয়া গিয়া টপ্ করিয়া ছেলেটার দুই কানে ধরিয়া আল্‌গোছে তাহাকে সেখান হইতে ঘরের দরজায় তুলিয়া আনিল।

"দিত যে এখুনি সাবাড় ক'রে! পেটের ভেতর ছোরা ঢুকিয়ে দিত যে!"

গোষ্ট তাহার লম্বা দেহটিকে নোয়াইয়া এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো

দাঁতগুলা বাহির করিয়া ছেলের গালের উপর খিঁচিয়া এক চড় বসাইয়া দিল।

"ভাগ্! ঘরে গিয়ে বস্‌গে যা চুপটি করে!"

ছেলেটা কাঁদিতে লাগিল।

ছেলের মা তখন দাওয়ার উপর উনানের ধারে বসিয়া সিদ্ধ আলু ছাড়াইতেছে। অনেক ওষুধ খাইয়া অনেক কবচ-মাদুলি ধারণের পর অনেক কষ্টে পড়্‌তি-বয়সের এই ছেলে ...

"মা'র কেনে শুভ-শুদু? মা'র কেনে? ছেলে যে গেল!"

কানা-উঁচু থালাটার উপর আলুগুলা পড়িয়া রহিল। সৈরবী-বৌ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কাদামাটি সমেত ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া বলিল, "আ-মর্! উর্‌গুণ নাই ছুর্‌গুণ সার! কাদা মেখেছে ত' হলো কি তার? বেশ করেছে!"

গোষ্ঠ বলিয়া উঠিল, "এ হে-হে, গেল গেল এ-বেটিও গেল আজ! মলো হয় ত কোন্ মোছলমানের হাতে।"

কিন্তু বৌ তাহার উল্‌টা বুঝিল। বলে, "আমি কেন রে সব্বনেশে! মর্ মর্—তুই মর্ মোছলমানের হাতে।"

আর জবাব চলে না। অন্য কোথাও হয় ত বা চলিতে পারে, কিন্তু গত পঁচিশবছরের অভিজ্ঞতায় গোষ্ঠ এ-টুকু খাঁটি জানে যে, এ-ক্ষেত্রে আর চলে না। সৈরবী-বৌকে সে চেনে।

"তা মরবি ত মর্—যাবি ত যা, বয়েই গেল! ছুতো-হাঁড়ি ফেলে দিলেই আবার নূতন হাঁড়ি তৎক্ষণাৎ ... "

কিন্তু ... "পেবাসী কোথা গেল?—পেবাসী!"

প্রবাসী তাহার বোন্। বিধবা বোন—ভাই-এর ঘরেই থাকে।

হাতের ঠ্যাঙ্গাটা মাটিতে বার-কতক ঠুকিয়া গোষ্ঠ আবার বলিল' "জানিস্? পেবাসী কোথা গেল—জানিস?"

সৈরবী-বৌ মুখটাকে তাহার ব্যাজার করিয়া বলে, "পাড়া-বেড়ানী মেয়ে কার সঙ্গে কোথা গেল তা আমি কি জানি?"

বলিয়াই সেদিকে পিছন ফিরিয়া ছেলেটাকে আড়্-কোলা করিয়া আপন মনেই পুনরায় সে আলুর খোসা ছাড়ায়।

পাঁচ-বছরের ডাগর ছেলে বগল-দাবা কি থাকে?

মায়ের হাতের ফাঁকে ভয়ে ভয়ে বাপের অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তির দিকে সে মিট্ মিট্ করিয়া তাকায়। বলে,

"পিসি ময়রা-ঘরে।"

"ওই হতভাগীই আগে মলো দেখছি। ভারি টিরিক্ টিরিক্ ফিরিক্ ফিরিক্ চব্বিশঘণ্টা—"

উঠানে দাঁড়াইয়া পেবাসীর নাম ধরিয়া গোষ্ঠ চেঁচাইতে লাগিল।

ময়রা-ঘর পাশেই।

দশ-বারোটা ডাকের পর জবাব আসিল, "যাই—"

পরণে চওড়া-পাড় শাড়ী, পান খাইয়া ঠোঁটদুইটা লাল,—চেহারা দেখিলে গোষ্ঠর বোন বলিয়া মনে হয় না। গায়ের রং-এ, গড়নে, সৌষ্ঠবে—ঢের তফাৎ। কপালে সিঁদুর নাই, নইলে সধবা বলিয়া ভ্রম হয়।

এক গোছা পান সৈরবী-বৌএর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া পেবাসী বলিল, "পান নাই শুনে মাথা ঘুরে গিয়েছিল বাবা। পান নাই, পান নাই, গাঁয়ে পান নাই,—এই নাও পান!"

গোষ্ঠ লাফাইয়া উঠিল—

"গুষ্টির মাথা! হারামজাদী জেনেশুনে গেল পান আনতে! রাঙাবি ঠোঁট সব, চোঁট রাঙা বেরোবে আজকেই! খবরদার বলছি ঘর থেকে পা বাড়িয়েছিস কি দিয়েছি অমনি ঠেঙিয়ে পা' ভেঙে'!"

রাগের চোটে হাতের ঠ্যাঙাটা গোষ্ঠ মাটিতে বারকতক ঠাঁইঠাঁই করিয়া ঠুকিয়া দিল।

পেবাসী বলিল, "কেন, আমার কেন? ভাঙ্‌গে তোর ওই—কেলেকেষ্ট—যাকে মাথায় তুলে নাচ্‌চিস্ দিনরাত—তার।"

ইঙ্গিতটা যে কাহার উপর সেকথা দাদাও বুঝিল বোও বুঝিল।

কিন্তু দাদার মুখ দিয়া কোনও জবাব বাহির হইবার পূর্ব্বেই সৈরবী-বৌএর মুখ খুলিল।

ছেলেটাকে বাঁ-হাত দিয়া সরাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "অ-মা-গ-! যার শিল তার নোড়া আবার তারই ভাঙ্‌ব

দাঁতের গোড়া! আমার খেয়ে মানুষ, আবার আমাকেই কিনা ... নাড় হয়ে ষাঁড়ের মত বেড়াচ্ছিস ঘুরে ঘুরে,—কি যে করছিস ভাবিস বুঝি তা তুইই জানিস—আর কেউ জানে না, না আর সব কাণা? কেউ দেখে না? কেউ জানে না? মুখের চোট্ ছাখো হারামজাদী ছুঁড়ীর।

পেবাসী ধরিয়া বসিল, "কি তুই দেখলি বল্ তবে তাই শুনেই যাই।"

এই লইয়া তুমুল ঝগড়া!

ছাড়ানো আলু কয়টা কতক থালায় কতক মাটিতে পড়িয়া হট্‌হট্ করিতে লাগিল, উনানের উপর ভাঙা একটা কড়াই চাপানো; সৈরবী-বৌ উঠিয়া দাঁড়াইল। পেবাসীও বুকের কাপড়টা দু ফেরতা করিয়া কোমর বাঁধিল।

এ বলে আমায় দেখ্—ও বলে আমায় দেখ্,

হাজার হোক্ বেটা ছেলে! গোষ্ঠ আর থাকিতে পারিল না, হাতের ঠেঙ্গা দিয়া পেবাসীর পায়ের গিঁটের উপর পড়াম্ করিয়া এক বাড়ি বসাইয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "মর ছুঁড়ী, হারামজাদী, পড়ে' থাক্ এইবার ঘরে! মুখে চুণকালি লেপে দিলে আমার! মুখ দেখাবার জো নেই গাঁয়ে!"

বলিয়া সে ঠেঙাটা হাতে লইয়াই হন্ হন্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

"মর্, সব মর্! মরে' যা! খালাস পাই তাহ'লে! আসুক্ মোছলমান্‌রা, নিজে ডেকে এনে দেখিয়ে দেব। দিক্ সব মেরে খুন্-জখম্ করে দিয়ে যাক্ ... বাপ্! ল্যাঠা চুকে যাবে তাহ'লে ... "

চালার খুঁটির কাছে পায়ে হাত দিয়া পেবাসী গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

... .

বামুন-পাড়ার মাঝখানে সরকারী কালীঘরের দাওয়া-উঁচু চালার নীচে তালপাতার একটা চাটাই-এ বসিয়া গাঁয়ের জনকতক মাতব্বর-গোছের ব্রাহ্মণ কি যেন পরামর্শ করিতেছিল। সুমুখের রাস্তার একপাশে ধূলার উপর উবু হইয়া পচাই সেখ বসিয়া আছে।

সমবেত ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে গোষ্ঠ একটি প্রণাম করিয়া পথের একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

গোষ্ঠকে দেখিবামাত্র স্বৃষ্যি রায় বলিয়া উঠিল, "এই যে! পারে না? এই বেটারা পারে না? বেটারা যদি একজোটে সব লাঠি নিয়ে দাঁড়ায় ত' মোছলমানের বাপের সাধ্যি কি ... না কি বল মুখুজ্যে?"

পক্ষাঘাতের দরুণ বাঁ-হাতটা মুখুজ্যের শিথিল হইয়া গিয়াছিল, ডান-হাতটা বারকতক নাড়িয়া বলিল, "লাঠি? একশ' বার ধর্‌বে! আলবাৎ ধরবে! আমরা হলাম গিয়ে—ওর নাম কি—বর্ণশ্রেষ্ঠ বাহ্মণ। লাঠি আমাদের ধরা নিষেধ। তা নইলে কি আর ...

গোষ্ঠ বলিল, "আজ্ঞে না মুখুজ্যে মশাই, আসুক! মোছলমানরা এসে আগে এই গাঁয়ের মেয়েগুলোকে দিয়ে যাক্ সাবাড় করে'—আমরা বেশ থাক্‌ব।"

কিন্তু তাহার সে অবান্তর কথায় কেহ কান দিল না।

রামাই সান্ন্যাল তাহাকে এক ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিল, "দূর গুয়োটা আহাম্মুখ কোথাকার! ... আরে এই পচাই সেখ! মাথা হেঁট্ করে বসে ত' আছিস্ দিব্যি! শোন্!"

পচাই সেথ মুখ তুলিয়া চাহিল।

সান্ন্যাল বলিল, "কানে ঢুক্‌লো ত' যা বললাম এতক্ষণ? বাস্! তোরা স্রেফ্ বলে' দিবি—এ গাঁয়ে ও সব কিছু করো না সায়েব্—এ গাঁ খুব ভাল গাঁ। তোদের জাতভাই সব—তোদের কথাই শুনবে বেশি। আর যদি নেহাৎ না ছাড়ে ত' ওই বিশলপুরটা দেখিয়ে দিস্। বল্—সায়েব, যাও তবে যাও ওই গাঁয়ে যাও, মারামারি কাটাকাটি করতে হয় ওইখানে করগে। শালারা ভারি বদ্! বুঝলি?"

"যে আজ্ঞে হুজুর!" বলিয়া পচাই শেখ ঘাড় নাড়িল, দাড়ি নাড়িল।

মুখুজ্যে বলিল, "বেটাদের কথার কি ঠিক আছে কিছু? মুখ শোঁকাশুঁকি হয়ে গেছে কি বাস—ওর নাম কি—গলায় গলায়। ... কাজ কি বাপু তোদের অত সব হাঙ্গামায়! কোথা কলকাতা—সাত-

সমুদ্দ, তের-নদী পার—কোথা কি হচ্ছে তা তো-বেটাদের কি রে?"

চালার খুঁটিতে দুই চড় মারিয়া রামাই বলিয়া উঠিল, "মুখ শোঁকাশোঁকি কি করলেই হলো নাকি হে! মারণের চোটে বেটাদের এ গাঁয়ের বাস উঠিয়ে দেব না? পাজি, ছুঁচো কাঁহাকা! অরাজক পুরী পেয়ে গেছে, না? বিটিশ্ গভর্‌মেণ্টো নাই? থানা-আদালত নাই? বেটাদের ধরে ধরে সব ফাঁসি লট্‌কিয়ে দেবে না?"

আবার ঘাড় হেঁট্ করিয়া পচাই শেখ সব শুনিতে লাগিল।

... ...

সেইদিনই সন্ধ্যায় পচাই শেখের সঙ্গে গোষ্টর দেখা—জগু দত্তর ভিটের ঠিক পাশেই। সন্ধ্যার নির্জ্জন পথের উপর দিয়া গোষ্টা একটুখানি তাড়াতাড়ি হাঁটিতেছিল।

গোষ্ট বলিল, "এই যে পচাই সেখ, সেলাম!"

"সালাম!" ঘাড় নাড়িয়া পচাই বলিল।

গোষ্ট বলিল, "শুন্‌লে? বেটাদের কথা শুন্‌লে ও বেলায়? বেটারা যেন সব নবাব!"

চলিতে চলিতে পচাই ঈষৎ হাসিল।

গোষ্ট বলিল, "তুমি ত ভাই ঘরের লোক। কি বল?" তাহার পর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "আস্‌বে? ওরা সত্যি-সত্যি আসবে নাকি?"

পচাই বলিল, "তোমরাও যেখানে আমরাও সেইখানে।"

"না না,—আসুক। আসে ত' আসুক! বিশলপুর দেখাতে তোমার বয়ে গেছে। তুমি সটান্ ওই-বেটাদের ঘর দেখিয়ে দিও। যত বেটা বামুন আছে এ-গাঁয়ে—ধরুক আর কঁ্যাচ কঁ্যাচ্ করে গলাগুলো দিক্ কেটে! না হয় আধ-হাত খানেক ছোরা চালিয়ে দিক্ পেটে,—একদম্ তল্‌-পেট বলে'! বুঝলে স্যাখ্‌জি?"

সেখ-জি আবার ঈষৎ হাসিল।

গোষ্ট বলিয়া যাইতে লাগিল, ঐ মাংস? তা তুমি কি ভাবছ—খেতে পারি না? পারি বই-কি! দাও মদ, আর এই এতটা ... ইয়ে—। মেরে' দেব কঁ্যাচাকঁ্যাচ।"

সেখ বলিল, "দোষ কি? ও মাংস ত' হালাল। পোষ্টাই হয়।"

মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারেই গোষ্ট খানিকটা থুতু ফেলিল। বলিল, "আর শুন্‌লে ত' তুমি? তখন একটা কথা বল্‌তে গেলাম ত' বলে কিনা, আহাম্মুক্! গাধা, তুই চুপ কর্। শালা, বেটা, ত' আমাদের ডাক-নাম! ... দিও স্যাখ্, এই বলে' রাখ্‌ছি তোমাকে,—ওরা এলে লিব্‌ভয়ে ব'লে দিও তুমি; না বল ত' আমার বেটার দিব্যি রইল তোমাকে।"

গোষ্ট তাহার ঘরের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

এদিক-ওদিক তাকাইয়া সে আর কিছু না বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

... ...

কিন্তু কোথায় বা শিখ্ আর কোথায় বা মুসলমান!

লোকজনের বিশ্বাস কিন্তু তখনও যায় না। বলে, "দাঁড়া, আগে শহর লুট্ করুক্—তবে ত' গাঁয়ে!"

আবার বলে,

"তোরা জানিস্ কি? গোমস্তাবাবুর খবরের কাগজটা একবার দেখিস্ দেখি!"

কাগজের তখন বিক্রির হুজুগ। এক খবর দশবার করিয়া বাহির হয়—দশটা আলাদা আলাদা নামে।

ছাপা খবর কখনও মিছে হয়?

কাগজ্ পড়িতে পড়িতে চোখের চশমাটা কপালে তুলিয়া গোমস্তাবাবু বলেন, "এই খবরের কাগজ নেওয়া আমার বরাবর—তা সে যেখানেই থাকি।"

যাহারা শুনিতে আসে তাহারা বলে, "দেখুন দেখি আপনি হলেন একজন জ্যান্তম্যান্ত লোক—।"

... ...

রোসেদ মিঞা বেপরোয়া আবার তাহার চুড়ির কারবার চালায়

পেবাসী বিধবা হইলে কি হয়—তবু চুড়ি পরে।

রোসেদ মিঞা একবার আসিলে হয়!

সৈরবী-বৌ বলে দিন-দিন চুড়ি পরা কি লা? বিধবা মেয়ের অত সখ ভাল নয়।"

পেবাসী সে কথায় কান দেয় না। আবার কথাটা একটুখানি ঝাঁকালো হইলে জবাবও দেয়। বলে, "তোমার কি বৌ? তোমার পয়সায় ত' পরি না।"

সেকথা মিথ্যা নয়। পয়সা সৈরবী-বৌও দেয় না— গোষ্টও দেয় না।

সৈরবী-বৌ চুপ করিয়া থাকে।

গোষ্টর দরজায় আসিয়া রোসেদ হাঁকে—"চুড়ি— !"

পেবাসী কাজ ফেলিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে। হাসিয়া বলে, "রেশমী চুড়ি?—ধানী-রঙের?"

রোসেদ মাথা হইতে ডালা নামাইয়া চুড়ি পরাইতে বসে।

নরম হাতখানা টিপিয়া টিপিয়া রোসেদ চুড়ি পরায়।

চুড়িটা আঙুলের গিঁট পর্য্যন্ত আসে, পেবাসী 'উ—হা' করিয়া চেঁচায়। গিঁট পার হইয়া গেলেই বাড়ানো হাতের তলায় মুখ গুঁজিয়া তখনি আবার ফিক্ করিয়া হাসে।

রোসেদ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে, "যাবি?"

"আ-মর্ খাল-ভরা!"

রোসেদ আর একটা চুড়ি পরাইতে পরাইতে বলে, "বল্ না?"

পেবাসী আবার হাসে; হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হুঁ—।"

আর কিছু না বলিয়া রোসেদ আপনমনেই চুড়ির পর চুড়ি পরাইতে থাকে।

পেবাসী বলে, "থাক্ থাক্ আর না। আর জায়গা কোথা?"

রোসেদের তখন হুস্ হয়। হাসিয়া বলে "ও —।"

পেবাসী উঠিয়া দাঁড়ায়।

হাসিতে হাসিতে রোসেদ হাত পাতে। বলে, "পয়সা?"

আড়-চোখে একবার হাসিয়াই পেবাসী ফিরিয়া দাঁড়ায়, তাহার পর ঘরে গিয়া ঢোকে।

চুড়ি পরা লইয়া আবার একটা কাণ্ড বাধে।

সৈরবী-বৌ বলে, "ওদোও ও কার পয়সায় চুড়ি পরে!"

গোষ্ট বলে, "মর্ না! অমন বোন্ মরাই ভাল।"

বৌ বলে, "কই মরেও না ত?"

পেবাসী বলে, "মরবই ত!"

বলিয়াই সে তার একপিঠ ঢেউ-খেলান কালো চুল খুলিয়া দিয়া কলসি কাঁখে পুকুরের ঘাটে স্নান করিতে যায়।

পুকুরের অগাধ জলে বোধকরি ডুবিয়া মরিবার সাধ।

কিন্তু সে-মরণ তাহার পছন্দ হয় না। জল লইয়া ফিরিয়া আসে।

... ...

সেদিন আর চুড়ি নয়,—আমসত্ব, কাগজিলেবু আর পাকা কলা।

পেবাসী বলে, "মরতে আবার ও-সব কেন?"

রোসেদ বলে' "চুড়ি কি রোজ-রোজ ভাঙে নাকি সবাই?"

গোষ্টর ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া বলে, "পিসি, কলা খাব।"

দুই হাতে দুইটা কলা দিয়া পেবাসী প্রথমে তাহাকে সেখান হইতে তাড়ায়।

"রাস্তায় দাঁড়িয়ে খায় না। ঘরে খেগে যা!"

ছেলেটা চলিয়া গেলে পেবাসী বলে, "কই দেখি? আমসত্ব দেখি?"

আমসত্ব দেখিবার নামে ফিস্ ফিস্ করিয়া দু'জনে কত কথা!

সে-সব কথা কেউ শুনিতে পায় না।

ময়রাদের ছোট-বৌ আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, "রম্ভা পাকা দাও দেখি এক পয়সার!"

আমসত্বটা মুখে ফেলিয়া দিয়া মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া পেবাসী বলে, "টক্। তেঁতুলের আমসত্ব।"

রোসেদ বলে, "না দিদি, আল্লার কসম্।"

পাকা কলাটা আলুগোছে রোসেদের হাতে ফিরাইয়া দিয়া ময়রা-বৌ বলে, "না, এটা তুমি বদ্‌লে দাও রসিদ।"

... ...

তিন দিন পরে —।

সেদিন সকালে উঠিয়া গোষ্ট দেখে,—পেবাসী নাই। ঘরে তাহার জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় যাহা কিছু ছিল কিছুই নাই।

ভাঙা হইলেও মাটির দোতালা কোঠাঘর। গোষ্ট শুইয়াছিল উপরে। পেবাসী একাই ছিল নীচে। কৃষ্ণ-পক্ষের আঁধার রাত ...

ছোট গাঁ। খবর পাইতে দেরি হইল না; মুসলমান-পাড়ার রোসেদ মিঞাও কাল রাত্রি হইতে নিরুদ্দেশ!

সৈরবী-বৌ বলিল, "জানি অনেকদিন ...। নিজের মরণ কবে হবে তাই জানি না, তাছাড়া সবই জানি। ... "

মাথা হেঁট করিয়া গোষ্ট বসিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল—কুড়ি-পঁচিশজন ল্যাঠিয়াল গুণ্ডা লইয়া রোসেদ মিঞা কাল রাত্রে গোষ্ট মালির বিধবা বোন্ পেবাসীকে মুখে কাপড় চাপা দিয়া ঘর হইতে জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া গেছে।

গোষ্ট বাঁচিয়া গেল। বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কুড়ি-পঁচিশ জনেরও বেশি। সব মোছলমান—সব দাড়ি! আর সবার হাতেই একটা করে' চক্‌চকে ছোরা।"

"চেঁচিয়ে গোলমাল করে' তুই লোক জড় করলি না কেন?"

"আজ্ঞে চেঁচাবার কি জো আছে! বলে, এই ছাখ্ ছোরা, কথাটি কয়েছিস কি ..."

সর্ব্বনাশ!

বামুন-পাড়ায় আবার কয়েকজন মাতব্বর লোকের মজলিস বসিল।

"লুকিয়ে লুকিয়ে এমন যদি হয় ত' ... এ ত ভারি ... গোষ্টা, তুই এক কাজ ক'র্!"

হাত জোড় করিয়া গোষ্ট বলিল, "বলুন!"

রামাই সান্যাল বলিল, "নালিশ করে আয় রোসেদের নামে।"

গোষ্ট কাঁচুমাচু করিতে লাগিল।

"আজ্ঞে নালিশ-মোকর্দ্দমার পয়সা .. আমি গরীব লোক .."

বুড়া নিয়োগী-মহাশয় বলিলেন, "তবে এক কাজ কর্ বাবা! থানায় ডাইরী লিখিয়ে আয়। ওরাই তদন্ত করবে।"

গোষ্ট বলিল, "তা বরং ..."

গোমস্তাবাবু উপস্থিত ছিলেন। চোখের চশমাটা কপাল হইতে চোখে নামাইয়া বলিলেন, হ্যাঁ তাই কর্। আর আমি বরং কাগজে একটা খবর পাঠিয়ে দিই—ছাপা হয়ে যাক্। কিছু করতে হবে না বাবা—দেশময় ঢি ঢি পড়ে যাবে।"

তিন চারিজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা।"

রেল-ষ্টেশনে থানা।

অনেক কষ্টে ভয়ে ভয়ে গোষ্ট ডায়েরী লিখাইয়া আসিল।

এদিকে সংবাদের খসড়া তখনও হয় নাই।

গোমস্তাবাবু নিজেও অনেক চেষ্টা করিলেন।

তাহার পর ছোট গোমস্তার হাতে কাগজ-কলম ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, লেখো হে লেখো দেখি!"

ছোট গোমস্তার বাপ্-জন্মেও এ-সব পাট্ নাই কোনো দিন। কলম তাহার আর চলে না!

গোমস্তাবাবু ধমক্ দিয়া বলিলেন, "গাধা! গাধা! একটি আস্ত গাধা তুমি!"

কিন্তু গাধাই বল আর যাই বল ...

গোমস্তাবাবু বলিলেন, "নিয়ে এসো—দু'তিন হপ্তার খবরের কাগজ নিয়ে এসো! দেখিয়ে দিই চোখে আঙুল দিয়ে—"

তাহার পর কপালের চশমা আবার চোখে নামাইয়া দুতিনটা খবরের কাগজ ওলট্-পালট্ করিয়া, অনেকক্ষণ পরে কোথাকার এম্‌নি একটা নারী-হরণের সংবাদের অবিকল একটা নকল মনে মনে আওড়াইতে আওড়াইতে গোমস্তাবাবু বলিলেন, "নাও, ধরো কলম! লিখে যাও! কাগজ ত পড় না কোনোদিন! আমি শালা কিনেই মরি। ... প্রথমেই লিখ—বেশ ডাগর-ডাগর করে'—'পল্লীগ্রামে ভীষণ কাণ্ড! হিন্দুরমণীর উপর মুসলমানের পৈশাচিক অত্যাচার!' বানান জান ত? না, তাও বলে দিতে হবে?"

ঘাড় নাড়িয়া চড়্ চড়্ করিয়া ছোট গোমস্তা কলম চালাইতে লাগিল।

গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বি লোকও উপস্থিত ছিলেন।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুখুজ্যে-মশাই ডানহাতের বাঁশের লাঠিটা বারকতক মাটিতে ঠুকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্, ঠিক্! পৈচাশিক—মানে, ঠিক্ পিচাশের মত! তা পিচাশ রাক্কসের মতই বটে বই-কি! রাক্কোসিক্ লিখে দিতে পার,—বুঝ্‌লে হে?"

লিখিবে কিনা—অনুমতির অপেক্ষায় ছোটগোমস্তা বড়গোমস্তার মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিল।

রামাই সন্ন্যাল বসিয়াছিল চালার একটা খুঁটি ঠেস্ দিয়া। বলিল, "বুঝলে গোমস্তা! বাঙ্গালী—মানে এই আমাদের এই মেয়েজাতটার ওপর—সব-বেটারই ...। সেই সেদিন,—তোমারই ওই খবরের কাগজে হে—সেই একবেটা গার্ড-সায়েব ... সেই এক কোন্ রেলগাড়ীর ..." "বলিয়াই হো হো করিয়া সে এক বেশ চাঁছা-ছোলা সহজ সুন্দর গলায় চমৎকার হাসি হাসিতে লাগিল।

গোমস্তাবাবু তখন অর্দ্ধনিমিলিত চোখে খস্‌ড়ার চিন্তায় আকুল! তিনিও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নাও—লিখে যাও তুমি,—গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি তখন ... কি রে? ক'টা হবে?"

চালার নীচে হাতজোড় করিয়া গোষ্ঠ দাঁড়াইয়াছিল; একটুখানি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "তা আজ্ঞে পহর-আড়াইএক ...

আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু গোমস্তাবাবু হাঁ হাঁ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দিলি ত' ছুঁয়ে? খুঁটিটা ধরলি ত' হাত দিয়ে? বেটা পাজি কোথাকার গাধা! বিনি-পয়সায় কাজ হচ্ছে কিনা, বেটা একবারে আনন্দে ইয়ে হয়ে গেল! হুঁকোটা রয়েছে চৌকিতে ঠেকানো—দেখতে পা'স্ না?"

নিতান্ত অপদস্থ হইয়া গোষ্ঠ তৎক্ষণাৎ হাত-চারেক পিছু হটিয়া গেল।

"তুমি কি দেখছ হে হাঁ করে তাকিয়ে? তুমি আপনার লিখে যাও না।"

ছোট গোমস্তা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর? তেস্‌রা জ্যৈষ্ঠ রাত্রি তখন—তারপর?"

... তাহার পর কোনরকমে মাত্র একটি ঘণ্টার মধ্যে অনেক কাটাকুটি অনেক অদল-বদলের পর, গোষ্ঠবিহারী মালীর ভগিনী-হরণের সংবাদটি শেষ হইল।

গোমস্তাবাবু বলিলেন, "দাও এবার এই ঠিকানায় পাঠিয়ে! ... দাও, আর কি করবে,—আমাদের তহবিল থেকেই দাও চারটে পয়সা।—ওরে ও গোষ্টা! দিস্ আমাকে চারটে পয়সা একসময় এনে' দিস! আচ্ছা থাক্, আর দিতে হবে না। কাল সকালে একবার আসিস্ ত কাছারিতে! উঠোনের ওই ঘাস-পাতাগুলো চেঁছে-ছুলে' সাফ্-সোফ্ করে' দিয়ে যাস্ বাপু, তাহলেই হবে।"

"যে আজ্ঞে হুজুর!" বলিয়া উঠানে মাথা ঠেকাইয়া গোষ্ঠ একটি প্রণাম করিল।

গোমস্তাবাবু চোখের চশমা এইবার কপালে তুলিলেন।

"বাস্! সাতটা দিন এইবার দাও চোখ বুজে' পার করে'! আস্‌ছে শনিবার দেখে নিও—ছাপা হয়ে গেছে।"

সান্ন্যাল বলিল, "অঃ! সাতটা দিন ত!"

"হঃ! অমন কত সাতটা দিন চোখ বুজে' পার করে' দিয়েছি বাবা! নাও, ওঠো এবার!"—অতিকষ্টে ডান-হাতের লাঠির উপর ভর দিয়া মুখুজ্যে-মশাই লট্ পট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মাৎসুয়্যামার আর্শি

জাপানী গল্প

(মিসেস্ টি, এইচ্, জেম্‌স-এর ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে)

শ্রীচিত্তরঞ্জন আচার্য্য

কয়েকদিন আগে কোন এক নিরালা জায়গায় একটি যুবক ও তাঁর স্ত্রী বাস কর্‌তেন। তাঁদের একটি ছেলে ও একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল; দু'জনেই ছেলেটিকে খুব ভালবাসতেন। দম্পতির নাম জানা নেই, কারণ অনেক দিন থেকে লোকে তাঁদের নাম ভুলে গেছে। তাঁরা যেখানে বাস্ কর্‌তেন সে জায়গাটির নাম মাৎসুয়্যামা,—এচিগো প্রদেশের অন্তর্গত।

ছোট্ট মেয়েটি যখন খুব শিশু, তখন কার্য্যগতিকে একবার তার পিতাকে জাপানের রাজধানী, প্রকাণ্ড শহরে যেতে হয়। রাজধানী অনেক দূরে' তাই শিশুর মা ও শিশুর পক্ষে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর, তাই পিতা তা'দের রেখে একলাই যা'ত্রা কর্‌লেন। পত্নী ও সন্তানের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, ফির্‌বার সময় তা'দের জন্য ভাল ভাল উপহার নিয়ে আসবেন।

শিশুর মা পরবর্ত্তী গাঁয়ের ওপারে কখনও যান নাই, তাই স্বামী এত দূরদেশে গমন করায় তিনি স্বভাবতই চিন্তিতা হ'য়ে পড়লেন বটে, কিন্তু যেখানে সম্রাট তাঁর বড় বড় ওমরাহদের নিয়ে থাকেন এবং যেখানে সুন্দর সুন্দর আশ্চর্য্য রকমের দেখ্‌বার জিনিষ আছে, সেখানে তাঁর স্বামীই গ্রাম থেকে সকলের আগে যাওয়ায় মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লেন।

অবশেষে স্বামীর ফিরে আস্‌বার সময় হ'ল। শিশুটিকে জম্‌কালো পোষাকে সাজিয়ে এবং নিজে স্বামীর পছন্দ-সই নীল রঙের একটি পোষাক প'রে স্বামীর অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

স্বামী এলেন। অনুরক্তা পত্নী স্বামীকে সুস্থ শরীরে ফিরে আস্‌তে দেখে খুব খুশী হ'লেন, এবং ছোট্ট মেয়েটি তার জন্য পিতা যে সব সুন্দর খেল্‌না এনেছিলেন তা' পেয়ে আনন্দে তালি দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল। পথে ও শহরে পিতা যে-সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছিলেন, একে একে তা'দের কাছে তা'র অনেক গল্প বল্‌লেন।

পত্নীকে বল্‌লেন—'তোমার জন্য একটি খুব ভাল জিনিষ এনেছি, এর নাম আর্শি। দেখ এর ভিতর কি আছে।'—এই বলিয়া তাঁকে সাধারণ কাঠের তৈয়ারি একটি বাক্স দিলেন। বাক্সটি খু'লে পত্নী তার ভিতরে একখণ্ড গোলাকার ধাতু দেখ্‌তে পেলেন। সেটার একটা দিক্ জমাট-বাঁধা রূপার মতো শাদা, এবং পাখী ও ফুলের ছবি দিয়ে সাজানো; অপর দিক্‌টা অতি স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল। যুবতী মাতা বিস্ময় ও আনন্দের সহিত সেটি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কারণ ওর ভিতর থেকে উজ্জ্বল চক্ষুযুক্ত ও বিস্ময়-পুলকিত একখানি সুন্দর মুখ দেখা যাচ্ছিল।

পত্নীর বিস্ময়ে এবং নিজে বিদেশ থেকে নতুন কিছু শিখে এসেছেন এটা জাহির কর্‌তে পেরে খুশী-মনে যুবকটি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—'কি দেখছ? পত্নী উত্তর কর্‌লেন 'একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার অধর কম্পিত হচ্ছে, যেন সে কিছু বল্‌ছে, আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেও আমারই মত অবিকল একটি নীল পোষাক প'রে দাঁড়িয়ে আছে।'

পত্নী যা জানেন না তা জানার ঈষৎ গর্ব্বের সহিত স্বামী উত্তর কর্‌লেন,—'বোকা, তোমার মুখই তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ! গোলাকার ধাতুটির নাম আর্শি। এ গাঁয়ে আমরা এর আগে এ জিনিষ না দেখ্‌লেও শহরের প্রত্যেকের কাছেই ওরকম এক একখানি আছে।'

পত্নী এই উপহার পেয়ে খুব মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। প্রথম কয়দিন আর্শিতে ঘন ঘন মুখ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কারণ তিনি আর্শি ও নিজের মুখের প্রতিবিম্ব এবারই প্রথম দেখ্‌লেন। কিন্তু পরে তিনি ভাব্‌লেন, অদ্ভুত দামী জিনিষটা তো রোজ রোজ ব্যবহারের জন্য নয়; তাই তাঁর বাক্সের অন্যান্য দামী জিনিষের সঙ্গে আর্শিখানাকেও বন্ধ করে রাখ্‌লেন।

কয়েক বছর অতীত হ'য়ে গেল। দম্পতি সুখে বাস করতে লাগ্‌লেন। তাঁদের জীবনের আনন্দ যে ছোট্ট মেয়েটি, সে তার মায়ের প্রতিকৃতিরূপে দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌ল এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও স্নেহশীলতায় প্রত্যেকেরই আদুরে হ'য়ে উঠল। নিজেকে সুন্দরী দেখে তাঁর মনে ক্ষণিক অহঙ্কার হ'য়েছিল, তা স্মরণ করে' আর্শি ব্যবহারে মেয়ের মনেও পাছে অহঙ্কারের উদয় হয়, এই ভয়ে মাতা আর্শিখানি সাবধানে লুকিয়ে রাখলেন। তিনি আর্শি-খানির কথা কখনও বল্‌তেন না, পিতা তো সে-কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। এই কারণে মেয়েটিও তার মাতার মতো নিজ সৌন্দর্য্যের বিষয় কিছুমাত্র অবগত না হ'য়েই ক্রমে ক্রমে বড় হ'তে লাগ্‌ল। আর্শির কথা, যা তার সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত কর্‌তে পারত, তার বিষয় সে কিছুই জান্‌তে পার্‌ল না।

একদিন এই ছোট্ট ও সুখী পরিবারে এক দুর্ঘটনা ঘটলো, স্নেহ ও দয়াশীলা মাতা পীড়িতা হ'লেন। কন্যা দিনরাত তাঁর সেবায় নিযুক্ত রইল, কিন্তু দিন দিন অবস্থা খারাপ দেখা গেল, অবশেষে তাঁর জীবনের আশাটুকু মাত্র রইল না।

কন্যা ও স্বামীর কাছ থেকে চির-বিদায় নেওয়ার সময় অতি নিকটে জেনে মাতা খুব দুঃখিতা হ'লেন। তিনি কন্যাকে কাছে ডেকে বললেন,—'বাছা, তুমি বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ আমার বড় অসুখ; আমার মৃত্যু খুব নিকটে, তোমাকে ও তোমার পিতাকে রেখে আমাকে একা চলে যেতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর, আমার মৃত্যু হ'লে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তুমি এই আয়নায় মুখ দেখ্‌বে; ওর ভিতর তুমি আমাকে দেখতে পাবে, এবং যখন দেখ্‌বে তখন জেনো আমিও তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি।'—এই কথাগুলি ব'লে আর্শিখানি বের ক'রে কন্যাকে দিলেন। কন্যা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল।

কিছুদিন পরেই মা মারা গেলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণা কন্যা মাতার অন্তিম-অনুরোধ ভুল্‌ল না। সে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় আর্শিখানি বের ক'রে একমনে অনেকক্ষণ ধরে মুখ দেখ্‌ত। আর্শির মধ্যে তার স্বর্গীয়া মাতার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা দেখে সে মুগ্ধ হ'ত। এ শেষ-জীবনের রুগ্ন বিবর্ণ বিশীর্ণ মায়ের চেহারা নয়; এ অনেক আগের সৌন্দর্য্য ও আনন্দ-উল্লাসে নিটোলভরা সুন্দরী যুবতী মায়ের চেহারাখানি! তাকে সে রোজ রাত্রে সারা দিনের দুঃখ কষ্টের কথা বল্‌ত, প্রাতে তাঁর কাছে সহানুভূত ও উৎসাহের জন্য প্রাণের আঁচলখানি বিছিয়ে দিত।

এই ভাবে দিনের পর দিন সে যেন তার মায়ের দৃষ্টির সাম্‌নে রইল, তাঁর জীবিতকালে তাঁকে সুখী কর্‌বার যেমন সে চেষ্টা কর্‌তো এখনও তেমনি কর্‌তে লাগ্‌ল। মায়ের মনে যাতে কষ্ট হ'তে পারে, এমন কিছুই সে কর্‌তো না। তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সামগ্রী আর্শি-খানির দিকে চেয়ে সে বল্‌ত,—'মা, তুমি আমাকে যেমন হ'তে ইচ্ছা কর্‌তে, আজ আমি তেমনি হ'য়েছি।'

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে আর্শির দিকে চেয়ে কথা কইতে দেখে একদিন তার পিতা তাকে ওরকম করার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। মেয়েটি বল্‌ল,—'বাবা, আমি রোজ আর্শির ভিতর মাকে দেখি এবং তাঁর সঙ্গে কথা কই।' তারপর সে তার মায়ের সেই শেষ ইচ্ছার কথা বল্‌ল এবং সে যে কখনও তা ভুলে নাই তাও তাকে জানাল। কন্যার সরলতা ও একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় মুগ্ধ হ'য়ে পিতা আনন্দাশ্রু বর্ষণ কর্‌তে লাগলেন। আর্শির মধ্যে লক্ষিত ছায়া যে তার নিজেরই সুন্দর মুখ, যা প্রতিদিনের সহানুভূতি ও একাগ্র-চিন্তায় তার স্বর্গীয়া মাতার মতো হ'য়ে উঠেছে, সে-সব কথা খুলে বলে কন্যার সরল বিশ্বাসে আঘাত করতে তাঁর আর মন উঠল না।

মাৎসুয়্যামার আর্শি

জাপানী গল্প

(মিসেস্ টি, এইচ্, জেম্‌স-এর ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে)

শ্রীচিত্তরঞ্জন আচার্য্য

কয়েকদিন আগে কোন এক নিরালা জায়গায় একটি যুবক ও তাঁর স্ত্রী বাস কর্‌তেন। তাঁদের একটি ছেলে ও একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল; দু'জনেই ছেলেটিকে খুব ভালবাসতেন। দম্পতির নাম জানা নেই, কারণ অনেক দিন থেকে লোকে তাঁদের নাম ভুলে গেছে। তাঁরা যেখানে বাস্ কর্‌তেন সে জায়গাটির নাম মাৎসুয়্যামা,—এচিডো প্রদেশের অন্তর্গত।

ছোট্ট মেয়েটি যখন খুব শিশু, তখন কার্য্যগতিকে একবার তার পিতাকে জাপানের রাজধানী, প্রকাণ্ড শহরে যেতে হয়। রাজধানী অনেক দূরে' তাই শিশুর মা ও শিশুর পক্ষে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর, তাই পিতা তা'দের রেখে এক্‌লাই যাত্রা কর্‌লেন। পত্নী ও সন্তানের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, ফির্‌বার সময় তা'দের জন্য ভাল ভাল উপহার নিয়ে আসবেন।

শিশুর মা পরবর্ত্তী গাঁয়ের ওপারে কখনও যান নাই, তাই স্বামী এত দূরদেশে গমন করায় তিনি স্বভাবতই চিন্তিতা হ'য়ে পড়লেন বটে, কিন্তু যেখানে সম্রাট তাঁর বড় বড় ওমরাহদের নিয়ে থাকেন এবং যেখানে সুন্দর সুন্দর আশ্চর্য্য রকমের দেখ্‌বার জিনিষ আছে, সেখানে তাঁর স্বামীই গ্রাম থেকে সকলের আগে যাওয়ায় মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লেন।

অবশেষে স্বামীর ফিরে আস্‌বার সময় হ'ল। শিশুটিকে জম্‌কালো পোষাকে সাজিয়ে এবং নিজে স্বামীর পছন্দ-সই নীল রঙের একটি পোষাক প'রে স্বামীর অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

স্বামী এলেন। অনুরক্তা পত্নী স্বামীকে সুস্থ শরীরে ফিরে আসতে দেখে খুব খুশী হ'লেন, এবং ছোট্ট মেয়েটি তার জন্য পিতা যে সব সুন্দর খেলনা এনেছিলেন তা' পেয়ে আনন্দে তালি দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল। পথে ও শহরে পিতা যে-সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছিলেন, একে একে তা'দের কাছে তা'র অনেক গল্প বল্‌লেন।

পত্নীকে বল্‌লেন—'তোমার জন্য একটি খুব ভাল জিনিষ এনেছি, এর নাম আর্শি। দেখ এর ভিতর কি আছে।'—এই বলিয়া তাঁকে সাধারণ কাঠের তৈয়ারি একটি বাক্স দিলেন। বাক্সটি খু'লে পত্নী তার ভিতরে একখণ্ড গোলাকার ধাতু দেখ্‌তে পেলেন। সেটার একটা দিক্ জমাট-বাঁধা রূপার মতো শাদা, এবং পাখী ও ফুলের ছবি দিয়ে সাজানো; অপর দিক্‌টা অতি স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল। যুবতী মাতা বিস্ময় ও আনন্দের সহিত সেটি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কারণ ওর ভিতর থেকে উজ্জ্বল চক্ষুযুক্ত ও বিস্ময়-পুলকিত একখানি সুন্দর মুখ দেখা যাচ্ছিল।

পত্নীর বিস্ময়ে এবং নিজে বিদেশ থেকে নতুন কিছু শিখে এসেছেন এটা জাহির কর্‌তে পেরে খুশী-মনে যুবকটি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—'কি দেখছ? পত্নী উত্তর কর্‌লেন 'একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার অধর কম্পিত হচ্ছে, যেন সে কিছু বল্‌ছে, আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেও আমারই মত অবিকল একটি নীল পোষাক প'রে দাঁড়িয়ে আছে।'

পত্নী যা জানেন না তা জানার ঈষৎ গর্ব্বের সহিত স্বামী উত্তর কর্‌লেন,—'বোকা, তোমার মুখই তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ! গোলাকার ধাতুটির নাম আর্শি। এ গাঁয়ে আমরা এর আগে এ জিনিষ না দেখ্‌লেও শহরের প্রত্যেকের কাছেই ওরকম এক একখানি আছে।'

পত্নী এই উপহার পেয়ে খুব মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। প্রথম কয়দিন আর্শিতে ঘন ঘন মুখ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কারণ তিনি আর্শি ও নিজের মুখের প্রতিবিম্ব এবারই প্রথম দেখ্‌লেন। কিন্তু পরে তিনি ভাব্‌লেন, অদ্ভুত দামী জিনিষটা তো রোজ রোজ ব্যবহারের জন্য নয়; তাই তাঁর বাক্সের অন্যান্য দামী জিনিষের সঙ্গে আর্শিখানাকেও বন্ধ করে রাখ্‌লেন।

কয়েক বছর অতীত হ'য়ে গেল। দম্পতি সুখে বাস করতে লাগ্‌লেন। তাঁদের জীবনের আনন্দ যে ছোট্ট মেয়েটি, সে তার মায়ের প্রতিকৃতিরূপে দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌ল এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও স্নেহশীলতায় প্রত্যেকেরই আদুরে হ'য়ে উঠল। নিজেকে সুন্দরী দেখে তাঁর মনে ক্ষণিক অহঙ্কার হ'য়েছিল, তা স্মরণ করে' আর্শি ব্যবহারে মেয়ের মনেও পাছে অহঙ্কারের উদয় হয়, এই ভয়ে মাতা আর্শিখানি সাবধানে লুকিয়ে রাখলেন। তিনি আর্শিখানির কথা কখনও বল্‌তেন না, পিতা তো সে-কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। এই কারণে মেয়েটিও তার মাতার মতো নিজ সৌন্দর্য্যের বিষয় কিছুমাত্র অবগত না হ'য়েই ক্রমে ক্রমে বড় হ'তে লাগ্‌ল। আর্শির কথা, যা তার সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত কর্‌তে পারত, তার বিষয় সে কিছুই জান্‌তে পার্‌ল না।

একদিন এই ছোট্ট ও সুখী পরিবারে এক দুর্ঘটনা ঘট্‌লো, স্নেহ ও দয়াশীলা মাতা পীড়িতা হ'লেন। কন্যা দিনরাত তাঁর সেবায় নিযুক্ত রইল, কিন্তু দিন দিন অবস্থা খারাপ দেখা গেল, অবশেষে তাঁর জীবনের আশাটুকু মাত্র রইল না।

কন্যা ও স্বামীর কাছ থেকে চির-বিদায় নেওয়ার সময় অতি নিকটে জেনে মাতা খুব দুঃখিতা হ'লেন। তিনি কন্যাকে কাছে ডেকে বললেন,—'বাছা, তুমি বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ আমার বড় অসুখ; আমার মৃত্যু খুব নিকটে, তোমাকে ও তোমার পিতাকে রেখে আমাকে একা চলে যেতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর, আমার মৃত্যু হ'লে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তুমি এই আয়নায় মুখ দেখ্‌বে; ওর ভিতর তুমি আমাকে দেখতে পাবে, এবং যখন দেখ্‌বে তখন জেনো আমিও তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি।'—এই কথাগুলি ব'লে আর্শিখানি বের ক'রে কন্যাকে দিলেন। কন্যা কাঁদতে কাঁদতে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল।

কিছুদিন পরেই মা মারা গেলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণা কন্যা মাতার অন্তিম-অনুরোধ ভুল্‌ল না। সে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় আর্শিখানি বের ক'রে একমনে অনেকক্ষণ ধরে মুখ দেখ্‌ত। আর্শির মধ্যে তার স্বর্গীয়া মাতার হাস্যোজ্জল মুখখানা দেখে সে মুগ্ধ হ'ত। এ শেষ-জীবনের রুগ্ন বিবর্ণ বিশীর্ণ মায়ের চেহারা নয়; এ অনেক আগের সৌন্দর্য্য ও আনন্দ-উল্লাসে নিটোলভরা সুন্দরী যুবতী মায়ের চেহারাখানি! তাকে সে রোজ রাত্রে সারা দিনের দুঃখ কষ্টের কথা বল্‌ত, প্রাতে তাঁর কাছে সহানুভূতি ও উৎসাহের জন্য প্রাণের আঁচলখানি বিছিয়ে দিত।

এই ভাবে দিনের পর দিন সে যেন তার মায়ের দৃষ্টির সাম্‌নে রইল, তাঁর জীবিতকালে তাঁকে সুখী কর্‌বার যেমন সে চেষ্টা কর্‌তো এখনও তেমনি করতে লাগ্‌ল। মায়ের মনে যাতে কষ্ট হ'তে পারে, এমন কিছুই সে কর্‌তো না। তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সামগ্রী আর্শিখানির দিকে চেয়ে সে বল্‌ত,—'মা, তুমি আমাকে যেমন হ'তে ইচ্ছা কর্‌তে, আজ আমি তেমনি হ'য়েছি।'

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে আর্শির দিকে চেয়ে কথা কইতে দেখে একদিন তার পিতা তাকে ওরকম করার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। মেয়েটি বল্‌ল,—'বাবা, আমি রোজ আর্শির ভিতর মাকে দেখি এবং তাঁর সঙ্গে কথা কই।' তারপর সে তার মায়ের সেই শেষ ইচ্ছার কথা বল্‌ল এবং সে যে কখনও তা ভুলে নাই তাও তাকে জানাল। কন্যার সরলতা ও একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় মুগ্ধ হ'য়ে পিতা আনন্দাশ্রু বর্ষণ কর্‌তে লাগলেন। আর্শির মধ্যে লক্ষিত ছায়া যে তার নিজেরই সুন্দর মুখ, যা প্রতিদিনের সহানুভূতি ও একাগ্র-চিন্তায় তার স্বর্গীয়া মাতার মতো হ'য়ে উঠেছে, সে-সব কথা খুলে বলে কন্যার সরল বিশ্বাসে আঘাত করতে তাঁর আর মন উঠল না।

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

(ইংরেজী ও স্কচ্ হ্রদপ্রদেশ)

আমাদের পিতৃ-পিতামহদের কাছে ইংরেজি ও স্কচ্ হ্রদ-প্রদেশের খুব সুখ্যাতি শোনা যেত। কিন্তু অ-দৃষ্ট কোনকিছুর খুব বেশি প্রশংসা শুন্‌লে অনেক সময়ে আবার উল্‌টো উৎপত্তি হয়। তখন মনে হয় সে প্রশংসাটা বাড়াবাড়ি বা প্রশংসাকার হয় ত আমাদের সমতুল্য রসজ্ঞ নন বলেই জিনিষটির এমন প্রশংসা করছেন। অন্তত আমার মনে ইংরেজি ও স্কচ হ্রদ-প্রদেশের প্রতি—বোধ হয় না দেখার জন্যই একটু কেমন যেন বিরাগের ভাব ছিল। ভাব্‌তাম স্কটলাণ্ড ও উইণ্ডারমিয়ার কী ই বা এমন মস্ত কিছু হ'তে পারে—সুইজর্লাণ্ডের পাশে! অনেকটা এই ভেবেই আমি এ যাবৎ ইংরেজী ও স্কচ হ্রদ-প্রদেশ দেখ্‌তে যাই নি।

এবারও সম্ভবত যাওয়া ঘটে উঠ্‌ত না—বিশেষত চারধারে গানের ও অন্যান্য অনেককিছুরই নিমন্ত্রণাদির প্রলোভনে যদি আমার কোনও এক বাঙালী তরুণ বন্ধু তাঁর স্ত্রীকে ইংরেজি ও স্কচ-হ্রদপ্রদেশ দেখিয়ে নিয়ে আস্‌তে না বল্‌তেন। একলা একলা অনেক কাম্য কাজও অনেক সময়েই করা হ'য়ে উঠে না, কিন্তু দুজনের উৎসাহ সহজেই পরস্পরের মনে সংক্রামিত হয়। আমার বান্ধবী অত্যন্ত মিশুক, রসজ্ঞ ও উৎসাহিনী ছিলেন। কাজেই অধ্যাপক বন্ধু দুএকবার আমাকে তাঁকে নিয়ে যেতে বলার পরেই দেখা গেল, আমরা দুজনেই কেমন যেন ভারি খুশী হ'য়ে উঠেছি। পরে দেখাও গেল যে, কাজটা বড় ভাল হ'য়েছিল। কারণ আমাদের ভ্রমণের মধ্যে এমন একটা সুন্দর বেপরোয়া, দায়িত্বহীন আনন্দ সঞ্চয়ের উপাদান ছিল যা খুব কম ভ্রমণের মধ্যেই পাওয়া যায়। বিশেষত আমাদের মতন নিতান্তই বাঙালীর পক্ষে।

"বিশেষত আমাদের মতন বাঙালীর পক্ষে" কথাটার একটু অর্থ আছে। য়ুরোপে বন্ধু শুধু বন্ধুর সঙ্গেই যে সব সময়ে বেড়ায় তা নয়—বান্ধবীর সঙ্গেও দেশভ্রমণ ক'রে থাকে। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক দেশে "পথি নারী বিবর্জ্জিতা" ব'লে একটি নীতির প্রভাব অদ্যাবধি জন-সাধারণের মনে বোধ হয় একটু বেশিরকম প্রবল। তাই সামাজিক জীবনে আমাদের বৈচিত্র্য এত কম। ভ্রমণে বৈচিত্র্যাভাব এই সত্যটিরই একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত মাত্র।

সে দিন 'বাংলালে' একজন তরুণ লেখকের আক্ষেপ পড়ছিলাম। তিনি লিখেছেন যে, আমাদের দেশে ভাল ছোটগল্প তৈয়ারি না হওয়ার একটা কারণ, আমাদের জীবনে নানা রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতার অবকাশের ঐকান্তিক দৈন্য। যদিও লেখকের এ মতটি সত্য মনে হয় না যে, বাংলা দেশ ছোটগল্পের দেশ নয়, তবু মান্‌তেই হয় যে, তাঁর আক্ষেপের মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। অর্থাৎ আমাদের কথা—সাহিত্যে বৈচিত্র্য অপেক্ষাকৃত কম; কম হ'তে বাধ্য। কেন বাধ্য—সেটা একটু পরিষ্কার করে বলি।

কয়েক বৎসর আগে শরৎচন্দ্র একদিন আমাকে কথায় কথায় ব'লেছিলেন যে, য়ুরোপে গল্প লেখা ঢের সহজ, কারণ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত।

'কংক্রীট' দৃষ্টান্তে আস্‌তে গেলে এই দৃষ্টান্তটিই নেওয়া যেতে পারে যে, কেন বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে একটু বেশি মিশ্‌বার সুযোগ পাবে না? আমাদের মনোজগতে সৃষ্টির রস উপস্থিত হয়—বিশেষ ক'রে নারীজাতির দানে। কাজেই জীবনে সব আনন্দ আমোদে নারীকে নন-কো-অপারেট ক'রতে বাধ্য ক'রে আমরা সৃষ্টির প্রেরণা যে কতখানি হারিয়ে ব'সে থাকি তা এ-দেশে এলে যেন মুহূর্ত্তে

বোঝা যায়। কারণ এ-দেশে আকাশ বাতাসে নারীর প্রভাব যে কত ওতপ্রোত, তার প্রেরণা যে প্রতি স্পন্দনে কতখানি চারিয়ে আছে, তার কল্যাণী হাতের পরশের চিহ্ন যে প্রতি-অনুষ্ঠানে কতখানি প্রত্যক্ষ তা যাঁরাই য়ুরোপে অন্তর্মুখী জীবনের সঙ্গে একটু সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই জানেন। ফলে, এ-দেশের সাহিত্য দিনে দিনে বহুধা, বহুমুখী ও ওজস্বী হয়ে উঠেছে। তবু আশ্চর্য্য এই, কৃপণ ভয় ও আগ্‌লে-রাখার দীন-কামনার যূপকাষ্ঠে আমরা এ-দেশের দুর্নীতিকে গালি দিয়ে বৃথা রিক্ততাকেই গৌরব মনে ক'রে কণ্ঠ-মালা ক'রে চলি! তাই মন প্রশ্ন ক'রে বসে যে, স্বাধীন আবহাওয়ায় সমান অধিকারে নারী ও পুরুষের মেলামেশা ও ভ্রমণ, আলোচনা ও আনন্দ-উৎসবের যথার্থ মূল্য আমরা কবে দিতে শিখ্‌ব ও একটু বেপরোয়া ও অনাবধান আমরা কবে হব? জাতীয় জীবনে কলাকারুর স্ফুরণকে সমৃদ্ধ করতে হ'লে 'যে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে' একথা আমরা কবে উপলব্ধি করব!

একটু বেশী বাগ্মী হ'য়ে পড়া গেছে হয় ত। কিন্তু এ-দেশে নানা দিকে জীবনের গতির পায়ের শৃঙ্খলমুক্তি নিত্য-নিয়ত চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা কল্পনা ক'রে মনটা এতই ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠে যে, 'কম-বক্তাকেও সুবক্তা হ'য়ে উঠ্‌তে' হয়—অজ্ঞাতসারে।

নীতিবাগীশেরা হয় ত গম্ভীর ভাবে শিরঃসঞ্চালন পুরঃসর বল্‌বেন যে, এ রকম মেলামেশায় বিপদ আছে। শুধু তাই নয় তাঁরা হয় ত কবিত্বের শরণ নিয়ে শান্ত স্বরে এমন কথাও বল্‌তে পারেন যে, নারী নিরালা গৃহচ্ছায়ে আর গৃহচর্য্যার কোমল স্পর্শে কতই না মনোজ্ঞ প্রসূন ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন, কাজেই কেন বাপু ওসব ভয়াবহ পরখ কর্ত্তে যাওয়া?

উত্তরে অনেক নব্য-ভরতীয় বলেন যে, না, স্বাধীনতা দিলে বিপদ বাড়বে না বরং কম্‌বে। এ কথা আমার সত্য মনে হয় না। কোনও বড় উপলব্ধির পথই নিষ্কণ্টক নয়। বিপদের, ব্যথার, অশ্রুর দাম না দিলে কোনও মহৎ লাভই

গ্রাসমিয়ার দ্বীপ

সম্ভব হয় না। তাই বিপদ বৃদ্ধির আশঙ্কা সত্ত্বেও বল্‌তেই হবে যে, এক বিপদের অভিসারেই জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি লাভ সম্ভবপর। সাহিত্য জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি বিকাশের অন্যতম কুসুম। কাজেই সাহিত্য বড় হ'তে পারে না—যদি

জীবনের গতিকে নিরন্তর সনাতনত্বের অনুশাসনে আড়ষ্ট করে রাখা যায়। একটি ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়ে এ কথাটা আরও পরিষ্কার ক'রে বলি।

বর্ত্তমান সময়ে ফরাসী সাহিত্য শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের অন্যতম। কিন্তু এ জন্যে এদের কত সব নর-নারীকে যে তীব্র বেদনা ও ব্যর্থতার দাম দিতে হ'য়েছে তার একটা উদাহরণ দেই—যা আমার কোনও পরিচিতার অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যে এসে প'ড়েছিল।

আমার এ ফরাসী বান্ধবী—লেখিকা, ও তাঁর স্বামী—কবি। স্বামী স্ত্রীকেই প্রেরণাসঞ্চারিণী রূপে বরণ ক'রেছিলেন। তাঁরা দুজনে একত্রে লিখ্‌তেন, ভাবতেন, আলোচনা করতেন। জীবন তাঁদের সুখময় ছিল।

এমন সময়ে আমার বান্ধবীর একটি রূপসী সখী তাঁদের মধ্যে অবতীর্ণ হ'লেন। বান্ধবী সখীকে প্রায়ই স্বামীর কাছে এনে একলা ছেড়ে দিতেন। স্বামী একদিন হঠাৎ তাঁকে বল্‌লেন যে, দম্পতির মাঝে তৃতীয়ার উদয় এত ঘন ঘন হওয়াটা ঠিক নয়। বান্ধবী হেসে উড়িয়ে দিলেন। বল্‌লেন, "তোমার প্রেমকে জোর ক'রে পাওয়ার কোন দামই আমার কাছে নেই। যদি ছাড়া পেয়েও সে বাঁধা থাকে তবেই আমার কাছে তার মূল্য। স্বামী চুপ ক'রে রইলেন।

কিন্তু ছাড়া পেয়ে প্রেম বাঁধা রইল না। বিপদ এল—যে বিপদ স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই আশঙ্কা ক'রেছিলেন। স্বামী তাঁর স্ত্রীর রূপবতী সখীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বান্ধবী অশ্রুজলের মধ্যে দিয়ে তাঁকে বিবাহবন্ধন হ'তে মুক্তি দিলেন। শুধু একটি নতুন পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর সব গেল—যা এ পরথ করতে না গেলে খুব সম্ভবত যেত না। কিন্তু তবু তিনি এজন্যে আক্ষেপ করেন না। এখন তিনি একান্ত বেদনার মাঝে একটি সামান্য বোর্ডিং চালিয়ে জীবিকা উপার্জ্জন করেন—কিন্তু বিপদের ভয়ে স্বামীকে যে রূপসী সখীর আকর্ষণ হ'তে মুক্তি দিতে চান নি এ জন্য গৌরব গর্ব্ব তাঁর অসীম। সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে পড়ে নাকি?

কিন্তু নীতিবাগীশেরা হয় ত বল্‌বেন, 'বাপু হে, তোমরা আজকালকার ছেলে, তাই এমন অন্যায় কথাটাকেও সমর্থন করলে। পরমেশ্বর স্বামী-স্ত্রীকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধেছেন, জীবনে সতীত্ব ও বিশুদ্ধতার মূল্য অসীম, সংসারে সংযমই পরম ও চরম নীতি—ইত্যাদি ইত্যাদি। ধর না কেন, বিপদ বুঝেও তোমার বান্ধবী কেন স্বামীকে নিরন্তর তাঁর রূপবতীর সখীর সঙ্গে মেলামেশার আগুনে ঘৃতাহুতি দিলেন? এ সময়ে কি তাঁর স্বামীর চিত্তচাঞ্চল্যের উপক্রম দেখেই সখীকে সরিয়ে নেওয়া উচিত ছিল না—বিশেষত স্বামী যখন নিজে তাঁকে সে অনুরোধ ক'রেছিলেন? তখন যদি তিনি পরিণামমূঢ় হ'য়ে রোমান্টিক না হ'তেন তবে আজ কি তাঁর জীবনে এমন ব্যর্থতা আস্‌ত? বাপু হে—শাস্ত্রে বলেছে কর্ম্মফল ভুগ্‌তেই হবে—অতএব হে আজকার ছেলেরা—জেনো সনাতন হিন্দুধর্ম্মই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম্ম।"

এ সাবধানী সম্প্রদায়ের চিরন্তন সনাতন-সর্ব্বস্বতার মধ্যেকার অসারতাটুকুকে বাদ দিলে মান্‌তে হয় যে, এঁদের কথার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর মেলামেশার সুযোগ সহজতর হ'লে বিপদ ও তথাকথিত পদস্খলনও সহজতর হ'য়ে উঠবেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও য়ুরোপ বলে যে, বিপদকে কোন মতে এড়িয়ে উদ্ভিদের মতন জীবনধারণ করাতেই মানুষের জীবনের সার্থকতা নয়। জীবনে ব্যথাকে কোন মতে এড়িয়ে চলাই সব চেয়ে বড় জিনিষ নয়, আসল জিনিষ হচ্ছে—ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে উপলব্ধি। আমার আর এক তরুণী য়ুরোপীয় বান্ধবী একদিন আমায় তাই বল্‌ছিলেন, "আমার অনেক সময়ে অনেক অন্যায় কাজ করতে ইচ্ছে হ'য়েছে যা আমি করি নি—শুধু ভয়ে ও ট্রাডিশনের গর্ব্বে। কিন্তু আজ মনে হয়, এর ফলে আমি জীবনে অনেকটা নিরাপদ স্বস্তি লাভ করলেও কোনো বড় উপলব্ধি পাই নি।"

জাতীয় জীবনে নর-নারীর মন যখন এই রকম সহজ তেজ ও অকুণ্ঠার ভাব চারিয়ে যায়—তখনই সে জীবন ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রগতির দৃশ্যে কি এ কথার পূর্ণ সমর্থন মেলে না? অথচ আমরা কথায় কথায় ভারতীয় নারীর তথাকথিত গতিহীন সুযোগহীন জীবনের বাধ্য-হ'য়ে সতী থাকাকে বড় করতে গিয়ে এ দেশের মেয়েদের হেয় প্রতিপন্ন করতে

প্রয়াস পাই। কিন্তু যে-দেশে মেয়েদের মনে এ রকম স্বাধীন চিন্তা ও ওজস্বিতা শিকড়পাত ক'রেছে সে দেশের মহত্ত্ব কি নিশ্চল স্রোতহীন পবিত্রতার চেয়ে ঢের বেশি গৌরবময় নয়?

সুতরাং জাতীয় জীবনকে বড় করতে হ'লে জাতির সাধারণ নর-নারীর প্রাণকে বড় করতে হবে, দিলকে দরিয়ার মতন করতে হবে, এমন কি একটু উচ্ছৃঙ্খলও হ'তে হবে—যদি দরকার হয়। তাই পল রিশার মহোদয়
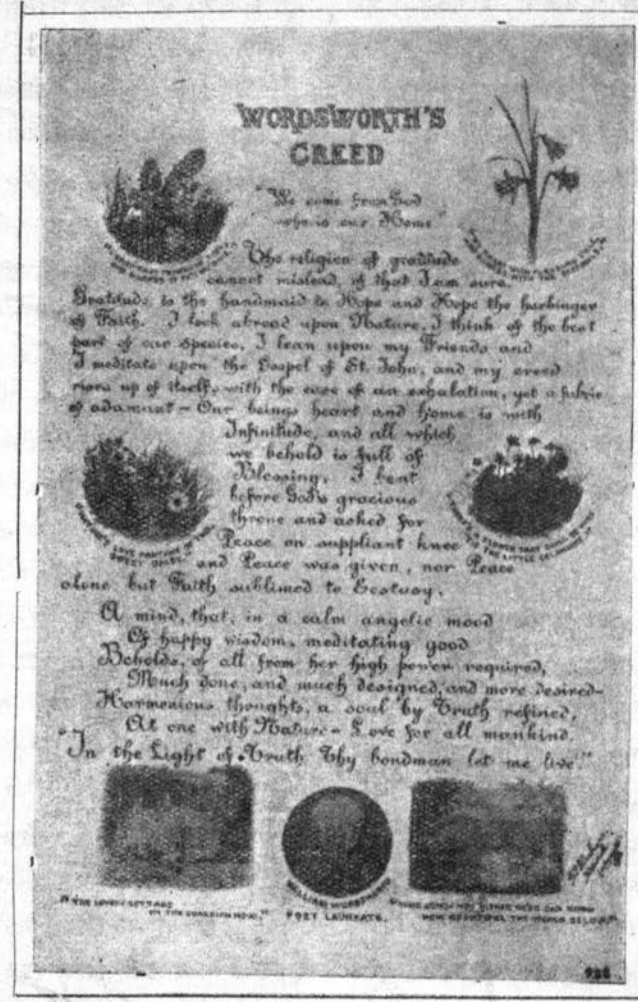
ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবন-বেদ।

আমাকে সেদিন আমার পূর্ব্বোক্ত বান্ধবীর সামনে যখন বললেন যে, ভারতের মেয়েরা বিদ্রোহ করে বাহির হয়ে না এলে ভারতের স্বরাজ অসম্ভব, তখন উত্তরে আমি একটু বাড়িয়েই বললাম, 'কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরাও আজকাল স্বাধীন হচ্ছে এ-কথা আপনি স্বীকার করেন না কি? তিনি হেসে বললেন, শোনো তবে বলি। আমার একটি সমাজ-সংস্কারক 'লম্বা-ভাষী' বাঙালী বন্ধু একদিন বাঙলাদেশে আমাকে এই কথাই বলেছিলেন যে, তাঁর ঘরে পর্দ্দা-টর্দ্দা নেই—তিনি নারীর মুক্তি চান। আমি তাতে তাঁকে বললাম, 'বেশ কথা, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন।' তিনি প্রথমটা মহা ফাঁপরে পড়লেন। শেষে ঢোক গিলে বললেন, 'আচ্ছা।' খানিক

বাদে পাশের ঘরে স্ত্রীকে ডেকে এনে অনেকক্ষণ তাকে কি সাধ্যসাধনা করলেন। তারপর তাঁর স্ত্রী আধহাত ঘোমটা টেনে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। অতঃপর স্বামীর তর্জ্জন গর্জ্জনে তিনি অবগুণ্ঠন মোচন করে আমার প্রতি সুঠাম কটাক্ষ ক'রেই অন্তর্হিতা হলেন।' পল রিশার মহোদয় হাস্‌তে লাগলেন। আমি ভারি লজ্জিত বোধ করলাম। এ রকম ঘটনা বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপে কল্পনাও করা যায় না! অথচ আমরা বলি আমরা এত বড়—কত সনাতন—কি আধ্যাত্মিক!

যাক্ ধান ভানতে শিবের গীত! তবে জল্পনার সাত খুন মাফ।

তবু একটু হ্রদ-প্রদেশের বর্ণনা করি, নইলে পাঠক-পাঠিকা রাগ করে বলবেন, "হ্রদ-প্রদেশ সম্বন্ধে বর্ণনা'র আশ্বাস দিয়ে এ কী ছল!"

আমরা দুজনে প্রথমে গেলাম—উইণ্ডারমিয়ারে। একদিন সেখানে হ্রদ-তটে একটি মনোজ্ঞ হোটেলে থেকে পরদিন ষ্টীমারে ক'রে হ্রদ-চারণ করতে যাওয়া গেল গ্রাসমিয়ারে।

প্রতি দৃশ্যের মধ্যেই একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। তাই সুইস হ্রদ ও নরওয়ের ফিয়োর্ডের পরেও ইংরেজী হ্রদ একটুও খারাপ লাগে নি। বরং সুইস হ্রদের চেয়ে এক হিসেবে ভাল লেগেছিল যে, এখানে পেশাদারী টুরিষ্টদের এত উপদ্রব ছিল না। সৌন্দর্য্যের মাঝখানে এই সম্প্রদায়কে দল বেঁধে চিরন্তন স্যাণ্ডউইচ ও বিয়ার সেবন করতে দেখলে মনটা কেমন যেন উচাটন হয়ে উঠত—বিশেষত যূথবদ্ধ মার্কিন টুরিষ্টদের দেখলে। ভাগ্যক্রমে ইংরেজী হ্রদে এঁদের নয়ন-মনোলোভা বিবরণ ও হট্টগোল হতে আমরা নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম। কিন্তু স্কটলণ্ডে পাই নি। তবে সে কথা যথাস্থানে।

গ্রাসমিয়ারে কবি ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থের কুটীর ভারি ভাল লাগল। সে কুটীরে ওয়র্ড্‌স্‌ওয়ার্থের পর অহিফেনবিলাসী ডি কুইন্সি কয়েক বৎসর ছিলেন। কুটীরটি বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল—এমন কি গৃহচুল্লীতে আগুনও জ্বালা ছিল। তাই মনে হচ্ছিল যেন কবি বাইরে বেড়াতে গেছেন, এখনি ফিরে এসে অগ্নিসেবন করবেন। ইংলণ্ডে গৃহচুল্লীর মধ্যে যে একটা সুন্দর স্বাগত সম্ভাষণ আছে, সেটা সেদিন যেন আমরা নূতন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম।

ঘরের মধ্যে কবির ব্যবহৃত আসবাবপত্র সযত্নে সুরক্ষিত ছিল ও একটি স্থলে একটি বাঁধান ফ্রেমে লিখা ছিল কবির সুবিদিত উক্তিটি—

"We live by admiration hope and fear."

আশে পাশে সৌন্দর্য্যের যেন আগুন লেগেছিল।

পাঠক-পাঠিকা হয় ত জিজ্ঞাসা করবেন, "কি রকম সৌন্দর্য্য, একটু খুলেই বল, শুনি!"

কিন্তু আমার মনে হয় যে, গদ্যে দৃশ্য সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করতে যাওয়ার মতন বিড়ম্বনা জগতে কমই আছে—বিশেষত অকবির পক্ষে! এর পরিণাম যেন অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের মামুলি তিলোত্তমা বর্ণনার মতনই ব্যর্থ হয়ে পড়ে মনে হয়। কারণ তিলোত্তমা কুন্দনন্দিনী ও আয়েষার বিস্তারিত রূপবর্ণনা পড়ার পর কেউই বোধ হয় মানসচক্ষে তাঁদের দেখতে পান না, অথবা তাঁদের প্রত্যেকের রূপের বৈশিষ্ট্যটুকু কল্পনা করতে পারেন না। এক চিত্রকরের বা মহাকবির তুলিতেই দৃষ্ট রূপের চিত্রটিতে বৈশিষ্ট্যটুকু চরমভাবে ফোটানো যায় মনে হয়। যদি কেউ বলেন যে, না, সাহিত্যেও যায়—তাহলে শুধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করা চলে, সূর্য্যমুখীর ও শৈবলিনীর রূপের মধ্যে প্রভেদই বা কোথায় ও বৈশিষ্ট্যই বা কোন্‌খানে? কেন না তাহলেই দেখা যাবে যে, তিনি আবছা ভাবে শুধু বলতে বাধ্য হবেন যে, এঁরা দুজনেই খুব—অত্যন্ত—অর্থাৎ কি না নিরতিশয় সুন্দরী। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র নায়কাদের রূপবর্ণনায় অত বাগাড়ম্বর না করলেই বোধ হয় ভাল হত। সত্য শিল্পী এস্থলে রূপের আভাষটি শুধু ইঙ্গিতে দিয়ে দেন—যেমন শরৎচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্যে দিয়েছেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনার সম্বন্ধেও সেই কথা। তাই এক কথায় বলা ভাল যে, ইংরেজী ও স্কচ হ্রদ-প্রদেশ—সুন্দর। কারুর যদি এ কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে তিনি যেন এ কথার অর্থ গিয়ে দেখে আসেন। ব্যস। এর চেয়ে বেশী বর্ণনা করতে হলে কবি হওয়া দরকার।

তবু একদিনের দৃশ্য মনে পড়ে—বিশেষ ক'রে। একটু কবিত্বের ব্যর্থ চেষ্টা করব।

সেদিন বাদল ঘনিয়ে এসেছিল। আমি ও আমার বান্ধবী তখন স্কটলাণ্ডের একটি বিখ্যাত হ্রদে একটি ষ্টীমারে শোভমান। হঠাৎ মনে হল যেন মেঘের ছায়া জলের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে কৃষ্ণশ্যাম আভায় তাকে নিবিড় চুম্বনে শিহরিত করে তুলছিল। চারিধারে আর্দ্র বাতাস ও উচ্ছ্বসিত বৃষ্টিশীকরস্পর্শে হ্রদটির সর্ব্বাঙ্গে যেন কি এক আকুল পুলক জেগে উঠেছিল। সেই স্তিমিত গোধূলির ম্লানিমায় কোথাও বা বন্য পাহাড়, কোথাও বা ঝরণা, কোথাও বা রাশি রাশি নবোদ্গত লতাপাতা, কোথাও বা ছোট্ট একটি স্নিগ্ধ কুটীর অপরূপ শোভায় রাঙিয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল বৃষ্টির মৃদু মর্ম্মরসঙ্গীত ও গিরি-নির্ঝরিণীর নৃত্যছন্দ যেন কাকে উদ্দেশ করে বলতে চাইছে —

যবে পুলক আজি এ হিল্লোলে
উছল রোলে
আশেপাশের বাঁশরীতে অচিন তালে নাচে ;—
যবে ঐ নীলাভ হ্রদতটে
সন্নিকটে
মঞ্জরীদল লতিয়ে দোলে পাতার ফুলে গাছে ;—
যবে মন্দ্র সজল বারিপাতে
শ্যামছায়াতে
আধচেনা সুর বাজে বরিষণের কিঙ্কিনীতে ;—
যবে চারিধারের সবুজ শাখে
মাঠের ডাকে
কোন্ অজানা সুবাস ঝুরে কার আগমনীতে ;—
তখন মর্ম্মে কাহার মূর্ত্তি ফুটি
দেয় যে লুটি
আকাশবাতাস, ঐ আননের সৌরভ-সম্পাতে,
কার পরশখানির সে ম্লানিমার
মধুরিমার
গন্ধে ভুবন তাই বুঝি আজ কাঁপে উছল রাতে।

কিন্তু হায়! মরজগতে কবিত্বের স্থান নেই—অদূরে আমেরিকান টুরিষ্ট দণ্ডায়মান!

ষ্টীমারে হঠাৎ একদল মার্কিন টুরিষ্টের অভ্যুদয় হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন কবিত্ব-টবিত্ব সব অতি-অকেজো। অন্তত তাঁদের কলরব, চাহনি ও মন্তব্য শুনে অন্য কিছু মনে হওয়া অসম্ভব ছিল। কেননা মার্কিন পরিব্রাজকের দেশ-ভ্রমণ—সে একটা বিশিষ্ট চীজ ও তাঁদের দেখার ধরণ—একটা বিশেষ মনোভাবের অভিব্যক্তি। এ কথার মর্ম্মার্থ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন না যাঁরা মার্কিন-পরিব্রাজকদের সঙ্গে একত্রে ভ্রমণ করেন নি। তাঁরা কি ভাবে দেশভ্রমণ করেন, সে বিষয় য়ুরোপে নানান গল্প প্রচলিত আছে। একটি এই :—

একজন আমেরিকান ক্রোরপতি ইজিপ্টে কোথায় গিয়েছিলেন। সেখানে একটি মন্দিরে একটি বাতি জ্বলছিল। মন্দিররক্ষক বলল, "এই বাতিটিকে কখনও নিভ্‌তে দেওয়া হয় না।" আমেরিকান ভদ্রলোক তাঁর খাতায় তথ্যটি টুকে নিয়ে বললেন, "কতদিন এ বাতি এমনভাবে না নিভে জ্বলছে?" মন্দিররক্ষক বলল, "দুতিন হাজার বৎসর।" আমেরিকান টুরিষ্ট বললেন, "আচ্ছা, তাহলে আমি একটা নূতন কিছু করব।" ব'লে ফুঁ দিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিয়ে খাতায় লিখলেন, "খৃষ্টের প্রাক্কাল হতে আমার আগে একাজ কেউ করে নি।" (পরে তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে এ বীরত্বের খবরটি ছিল অবশ্য।)

এ হেন মার্কিনদল-পরিবৃত হয়ে স্কটলাণ্ডে ট্রসাক হ্রদে যাবার জন্যে আমরা একটি বিরাট চৌঘুড়ি কোচগাড়ী নিলাম। কারণ সে পার্ব্বত্য পথে এই রকম চৌঘুড়ি 'কোচ'ই নাকি সব চেয়ে নিরাপদ। খুব ধীর তার গতি। তাই বেশ একটা অভিনবত্বের আস্বাদ পাওয়া গেল। য়ুরোপের নিরন্তর বিদ্যুদ্বেগ গতির চাপে দমবন্ধ মতন হওয়ার পরে এ প্রাচ্য মন্থরগতি ভারি আরামদায়ক ঠেকে। তাই মনে হয় যে, ডিকেন্সের সময়ে যে মানুষ কোচগাড়ীতেই ভ্রমণ করত—সেটা অবিমিশ্র দুঃখ ছিল না। অন্তত কোচমানরা এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল। মনে পড়ল রেলগাড়ীর অভ্যুদয়ে বিমর্ষ কোচমানপ্রবর কোচগাড়ীর

শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে একজন বিপুলকায়া যাত্রীকে বলেছিল :—

"Never get into a railway train ma'am."

বিপুলকায়া জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ?" কোচমান গম্ভীর মুখে বলল, — "cause ? it is dangerous !" বিপুলকায়া ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "What do you mean ?" কোচমান মুখ আরও অন্ধকার করে বলল, "You see, train's are upset". বিপুলকায়া বললেন, "But coaches are upset too, aren't they ?" কোচমান অম্লানবদনে বলল, "I admit they are ; but you see ma'am, it's like this : if a coach is upset, there you are. But if a train's upset you don't know where you are".

বেল্‌স্‌ফিল্ড হোটেল থেকে বাউনেশ উপসাগরের দৃশ্য
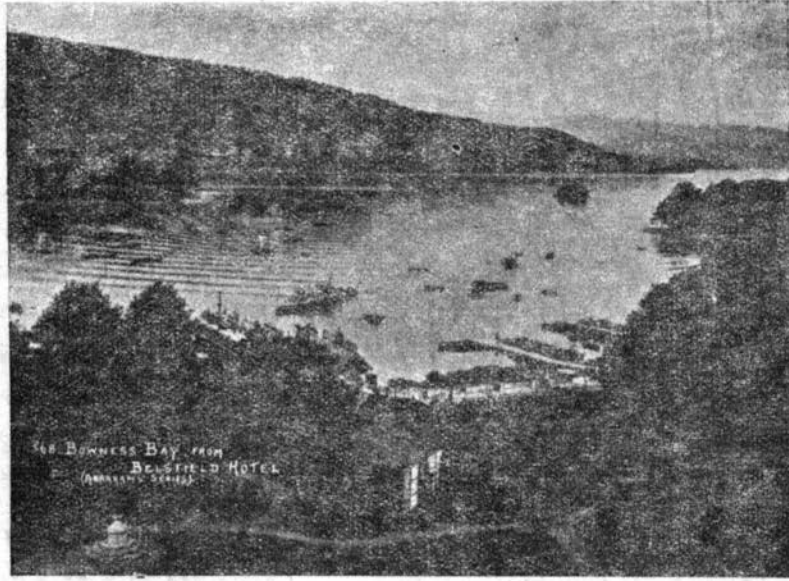
কিন্তু মার্কিন টুরিষ্টরা কোচের মন্দগতিতে মোটেই খুসী হয়েছিলেন বলে মনে হল না। বুদাপেস্তে অনেকদিন আগে একটি মার্কিন তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমেরিকানেরা শুধু এক জিনিষে বিশ্বাস করে—সে হচ্ছে গতি।"

কোচে মার্কিন প্রতিনিধিদের মুখ দেখে ও আশে পাশের দৃশ্য সৌন্দর্য্যাদির প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে বার বার মনে হচ্ছিল যে, এঁরা কি দেখতে ভ্রমণে বাহির হন ? এঁরা কি সকলেই একছাঁচে গড়া। আমার বাঙালী সঙ্গিনী বললেন, "হাঁ। মনে আছে, আমি সেদিন বলেছিলাম যে, এ দেশের ল্যাণ্ডলেডীরা হচ্ছে একটা 'টাইপ,' সৃষ্টির আদিম কাল থেকে যার কোনও বদল আজ অবধি কেউ দেখে নি ! এই মার্কিন টুরিষ্টদের 'টাইপ'টি হচ্ছে ঠিক তেমনি আর একটি 'টাইপ'।"

বান্ধবীর কথাটা যে কত সত্য সেটা অবিলম্বেই আরও ভাল করে চোখে পড়ল।

কেন না হঠাৎ কোচের মধ্যে আসীন এক মার্কিন-দম্পতির সঙ্গে আমাদের আলাপ জমে

গেল। তাঁরা আমাদের দু একটি কথার পরেই তাঁদের কার্ড দিলেন—যেন আমরা আমেরিকায় সদলবলে তাঁদের বাড়ীতে চড়াও হই; ভারতীয় সঙ্গীত-শুশ্রূষা (শ্রবণেচ্ছা) তাঁদের মনে বহুদিন যাবৎ বিপর্য্যয় রকম শিকড় গেঁথে বসে আছে; আমার মতন গায়কের গান শুনতে তাঁদের আগ্রহ স্বতঃই বিপুল ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন করে জানলেন যে আমার গানের ক্ষমতা হৃৎস্তম্ভিনী?"

উত্তরে জানা গেল, শীকারচতুর মার্জ্জারের গুম্ফই যে তাকে চিনিয়ে দেয় এ কথা শাস্ত্রসিদ্ধ। সাধু!...

তারিফে যে তেত্রিশকোটী দেবতা খুসী হবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেন, আমি ত সামান্য মানব!

হৃষ্ট হয়ে তাঁদের সঙ্গে গল্পালাপ জুড়ে দেওয়া গেল।

দু'চার কথার পরই মার্কিন ভদ্রলোক বললেন, তাঁরা 'এগ্রা'য় গিয়েছিলেন।

সেটা ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের অন্তর্গত জিজ্ঞাসা করতেই পার্শ্বস্থা বান্ধবী বললেন, "আঃ—আগ্রা গো, আগ্রা—এটুকু আর বুঝে নিতে পার না!"

লজ্জিত হয়ে মাথা চুলকিয়ে বললাম, "বড় আনন্দের কথা ... কিন্তু তাজমহল কি রকম লাগল?"

ভদ্রলোক অম্লানবদনে বললেন, "ভাল বই কি—কিন্তু একটা পাগলামি!" তিনি crazy কথাটি ব্যবহার করেছিলেন মনে আছে।

আমার দুই পাশে দুই বাঙালী বান্ধবী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগলেন।

বললাম, 'ঠিক বলেছেন, নইলে একটা সামান্য স্ত্রীর জন্যে—''

—"তা বটেই ত—কত ডলারই খরচ হয়েছে! ..."

টাইপ নয়?

জানা গেল তাঁরা গত জানুয়ারী মাসে বীরপদদাপে বাহির হয়েছেন—একটি অত্যন্ত সহজ কাজ করতেঃ—অর্থাৎ, ভূ-প্রদক্ষিণ। তারপর জানা গেল যে, কাজটি তাঁরা এতই সহজ জ্ঞান করেন যে দু'চার দশজনের পার্টিতে এ কার্য্য সুসাধিত হয় ব'লে তাঁরা ম'নে করেন না। তাই তাঁরা বাহির হন ৬৩০ জনের বাহিনী গঠন করে! Party with a vengeance বটে!

কিন্তু অনতিবিলম্বে দেখা গেল যে, তাঁদের ঝুলিতে এর চেয়েও আশ্চর্য্য কীর্ত্তি ছিল। সেটি হচ্ছে Speed.

কেন না জানুয়ারী মাসে যাঁরা নিউইয়র্কে জাহাজে চ'ড়ে জাপান, "এগ্রা", কলম্বো, ইতালি, গ্রীস প্রভৃতি পর্য্যটন ক'রে মে মাসের মাঝামাঝি উল্কাবেগে স্কটলাণ্ড তীর্থযাত্রা সমাপন ক'রে নক্ষত্রবেগে লণ্ডনাভিমুখী হ'তে পারেন তাঁদের গতিশক্তির সামনে শ্রদ্ধানত না-হওয়া যেমন অসম্ভব তাঁদের ভ্রমণনীতিতে বিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা তেমনই দুরূহ। কেবল মনের কোণে কুটিল ছায়ানিবিড় শঙ্কা জাগে "এ রাম মনুষ্য কি'না!"

শুনেছি ভ্রমণ করি আমরা প্রত্যেকেই আলাদা ভাবে—প্রতি দৃশ্যকে আমরা প্রত্যেকেই দেখি আলাদা চোখে ও প্রতি অভিজ্ঞতা থেকে রসাস্বাদন করি নিজের বৈশিষ্ট্যের আলাদা রসনা দিয়ে। কিন্তু মনে হয় আমেরিকান টুরিষ্টদের সম্বন্ধে এ নীতি খাটে না। কারণ কেন জানি না মনে হয় যে, তাঁরা সকলেই একই চোখে দৃশ্য দেখেন, একই কানে রেডিয়ো-কন্সার্ট শোনেন, একই ভাবে প্রোগ্রাম করেন, একই ধরণে নোট নিতে নিতে ভূ-প্রদক্ষিণে রত হন ও একই সুরে বলেন:

"ভিয়েনা? ... দাঁড়াও ... ওহো দেখেছি বই কি। সেখানে আমার স্ত্রী একটি হ্যাট কিনেছিলেন।"

সেদিন ভিয়েনায় এক বিখ্যাত বেহালাবাদক-বন্ধুর কাছে শুনলাম তাঁর বেহালা শুনে একজন আমেরিকান টুরিষ্ট তাঁকে এক তোড়া ফুল উপহার দিয়ে বলেছিলেন, "মহাশয়, আমি পাঁচ ডলারের টিকিট ক'রে এসেছিলাম, কিন্তু কি বলব ... যা শুনলাম তার দাম আট ডলারের চেয়েও বেশী।"

ও রকম নিঃসংশয় তারিফ-পদ্ধতিতেও সব আমেরিকানই সমধর্ম্মী।

কাজেই জগতে মানুষে মানুষে যে ভেদ থাকতে বাধ্য এ কথা এখন থেকে অত জোর ক'রে যেন আমরা আর না

বলি। সংসারে সব জিনিষেরই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আছে—কেবল ডলারের ছাড়া।

* * *

আমেরিকান টুরিষ্টদল একঘন্টা ট্রসাকে হৈ চৈ করে ঘুরে প্রস্থান করলে পর সে চাঁদনিরাতে আমরা তিনজনে ট্রসাক হ্রদের শোভা একটু ধীরেসুস্থে উপভোগ করতে ব্রতী হলাম। সে রাতে ট্রসাক হ্রদের বনানীর সে শ্যামলঘন শোভা বোধ হয় কখনো ভুলব না। মনে হ'তে লাগ্‌ল কেবল একটা প্রশ্ন যে, নাগরিক-জীবনের সঙ্গে এই রকম সৌন্দর্য্য-উপভোগের সুযোগ যে ক্রমে বিরলতর হয়ে আস্‌ছে সে ট্রাজিডিটির প্রতি আমরা যথেষ্ট সচেতন কি না? কেন না সেদিন বার বার মনে হয়েছিল যে, এ সৌন্দর্য্যপান একটা অত্যন্ত স্থূল তৃষ্ণানিবৃত্তি—সৌখীন ভাব-বিলাসিতা মাত্র ত নয়। অথচ নাগরিক জীবনের ধোঁয়া, ঘর্ঘর ও আঁধির সঙ্গে ক্রমে আমরা এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি যে, হৃদয়ের নিহিত আকাজ্ঞাগুলিকে কত সময়েই উপবাসে রেখে শেষে নষ্ট করে ফেলি! যাক্‌। এ আবার কি ধান ভান্‌তে শিবের গীত!
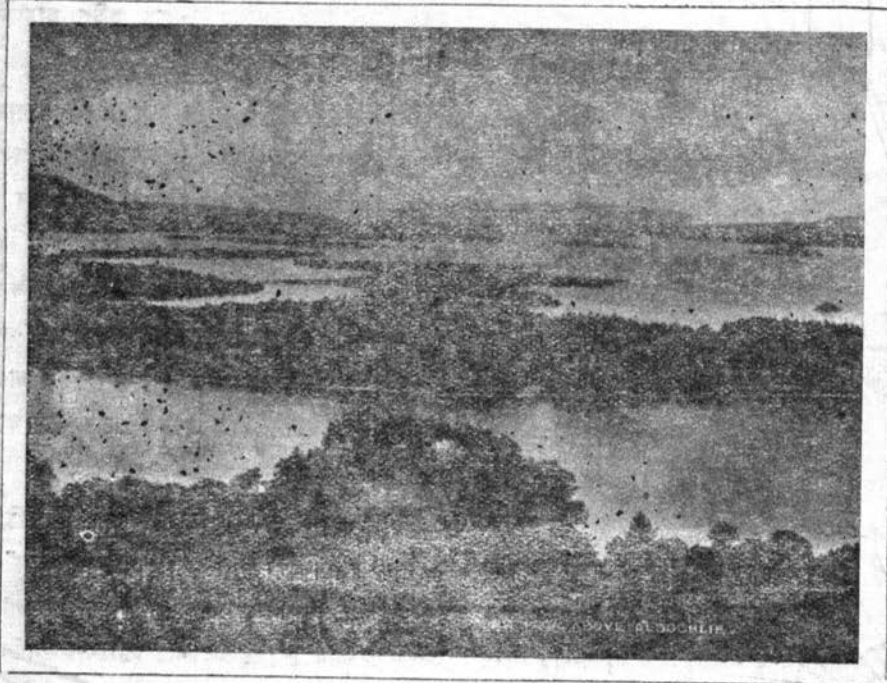
লক্‌ লমণ্ড

তার পরদিন এডিনবরার আমার এক সুরসিক বাঙালী বন্ধু এসে আমাদের আনন্দ সমধিক বর্দ্ধন করলেন। তিনি বললেন, তিনি খুব ভাল দাঁড়ী। কিন্তু যখন তাঁর ভরসায় বুক বেঁধে আমরা চারজনে নৌকাবিহারে ব্রতী হলাম তখন অন্তত আমার বন্ধুটি যে খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না তা বুঝতে কারুরই বেশী অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় নি। কারণ তরনীপ্রবর বন্ধুবরের দাঁড়চালনায় যে রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্ষণে ক্ষণে দিক্‌ বদ্‌লাতে লাগল তাতে সেই বিরাট হ্রদবক্ষে খুব আশ্বস্ত হয়ে উঠবার কোনও সঙ্গত হেতুই খুঁজে পাওয়া গেল না।

অতঃপর বন্ধুবর হেসে বল্‌লেন যে, নৌকাবক্ষে প্রকৃতির অধরসুধা পান করার মধ্যে একটা বিশিষ্ট রস আছে বটে কিন্তু এ বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে সেরা—মোটর সাইক্‌লে।

কি করা! তাঁর পৃষ্ঠাবলম্বী হ'তেই হ'ল—বিশেষত যখন তিনি বিশেষ ক'রে ভরসা দেওয়ার পর আমার বীরত্বাভিমানে আঘাত দিলেন যে, ভয় কি রায় মহাশয়!

বন্ধুবরের পৃষ্ঠ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রুদ্ধশ্বাসে ঘণ্টাখানেক বাহ্যিক প্রশান্তি বজায় রেখে এটা বোঝা গেল বটে যে, বন্ধুবর মিথ্যা বলেন নি। কেবল মোটর সাইক্‌লে চড়ে প্রকৃতির অধরসুধা পান করার মধ্যে যে বিষম রকম বৈশিষ্ট্য আছে সেটির যথাযথ বর্ণনা করা বড় কঠিনও মনে হয়। তবু সে চেষ্টা এক বার করব—কারণ যা কঠিন তাই করতে যাওয়াই নাকি মানুষের কর্ত্তব্য—য়ুরোপ বলে।

এ দ্বিচক্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এই যে, মাধ্যাকর্ষণের করাল কুটিল দুরভিসন্ধিকে অন্য কোনও যানে অনুরূপ ভাবে পরাস্ত করার যুদ্ধজয়ের আনন্দ আমাদের জাগ্রত মনে সঞ্চিত হ'য়ে ওঠে ব'লে ত মনে হয় না;—তাছাড়া যখন প্রতি মুহূর্ত্তে আশেপাশের গাছপালার নিকট-চুম্বন অত্যন্ত বেশি উদ্যত ঠেকে, তখন তাদের এড়ানোর মধ্যেও উদাসীন সন্ন্যাসীর প্রলোভন এড়িয়ে চলার মতন একটা আনন্দ মেলে; এবং সর্ব্বোপরি, প্রতি মুহূর্ত্তে যখন ভূমিতলের উর্দ্ধে উৎক্ষেপ নিরতিশয় স্বাভাবিক মনে হয় তখন যে ওলট-পালটের অনুভূতির মধ্যেও প্রকৃতির রস উপভোগ করার সজাগ চেষ্টা একটা মস্ত কৃতিত্ব, এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

সুতরাং বন্ধুবর মাঝে মাঝে যখন তারস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, কেমন লাগ্‌ছে তখন আমি সত্য কথাই ব'লেছিলাম যে, প্রকৃতির অধরসুধার মধ্যেকার ঠিক এ রসটি ইতিপূর্ব্বে কখনো এমন ভাবে পান করবার সুযোগ পাই নি।

কেবল সঙ্গে সঙ্গে, কেন জানি না, আমার একটি বন্ধুর কথা মনে হচ্ছিল যিনি সঙ্গীদের পার্ব্বত্য পথে অশ্বারূঢ় হ'তে দেখে চক্ষুলজ্জায় ঘোড়সোয়ার হ'তে বাধ্য হ'য়েছিলেন। মন্দলোকে অবশ্য সন্দেহ ক'রেছিল যে, সেদিন নাকি তিনি যে পরিমাণে বাহনকে চালিয়েছিলেন বাহন তাঁকে তার চেয়ে বেশি চালিত ক'রেছিল। কারণ—(অবশ্য তাঁর অশ্বারোহণে পারদর্শিতার প্রসিদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হওয়ার দরুণই এটা হ'য়েছিল নিশ্চয়!) দুষ্ট লোকে আজও অবধি নাকি নানা রটনা রটায় শোনা যায়। যথা, শোনা যায় সেদিন নাকি কখনো অশ্ববরকে মুদীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছোলা খেতে দেখা গিয়েছিল, কখনো বা পথি-পার্শ্বস্থ ঝোপের তৃণশষ্পাদির সদ্ব্যবহারে রত হয়েছিল; ও কখনো বা পার্শ্বস্থ ডোবায় নিরর্থক জলপান করতে নিরত ছিল;—এবং বন্ধুবর নাকি নিতান্ত অসহায় ভাবে শুধু বাহনের লাগাম ধ'রেই নিজের অশ্বারোহণপটুতা সপ্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু মূঢ় নিন্দুকেরা জানে না যে, বন্ধুবর কি দ্বিপদ কি চতুষ্পদ কারুরই স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো চিরকালই দুর্নীতি বলে প্রচার করে এসেছেন!

আমার সেদিনকার বন্ধুবরের পৃষ্ঠালিঙ্গনের ধরণ দেখে আমার বান্ধবী অনুরূপ ভুল সিদ্ধান্ত করেছিলেন বলেই এত কথা বলার প্রয়োজন হল। বস্তুত ভয় আমি পাই নি—তবে কি না উপভোগের চরম সীমায় আমার এই আশ্চর্য্য আঁখিদ্বয় কখনো কখনো অনুচিত বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তবে এ কথা আমার খুব ভাল করে না জানার দরুণ বান্ধবী অনুধাবন করতে পারেন নি!

কিন্তু আশ্চর্য্য একটু হতেই হল যখন মোটর-যানে যেতে যেতে বন্ধুবরও আমাকে বললেন, "রায় মহাশয়—বৃথা। আপনার কাজ এ নয়। রবিবাবু বিলিয়ার্ড খেলে আনন্দ পাচ্ছেন কল্পনা করা যায় কি?"

আমি বললাম, "তা বটে—কিন্তু মোটর সাইকেল্‌ চড়ার মধ্যে একটি অসাধ্যসাধনের আনন্দ যাবে কোথা? ব্রাভো—কি কাণ্ডই আজ করা গেল!"

দীওয়ান-ই-হাফিজ

নজরুল ইস্‌লাম

কোন্ বেদনায় নিলাম বিদায় 'দিল্‌জানী' আর দিল্ জানে
বদ্-নসিবের দানাপানি টান্‌ছে সে কোন্ দূর্ টানে ॥

তোমার সিঁথির মতির মতন নজর দোবো অশ্রু-বুঁদ্ ।
সেই দূতীরে, সালাম তোমার পৌঁছাবে যে মোর পানে ॥

এস প্রিয়া, আশীষ মাগি, আমার সাথে হাত উঠাও,—
তোমার প্রাণে বিশ্বাস আসে, আসেন খোদা মোর ত্রাণে ॥

মোদের 'পরে জুলুম যদি করেই জগৎ ঈর্ষাতুর,
ভয় কি সখি, মোদের খোদা শোধ নেবে তার সেইখানে ॥

তোমার শিরের 'কসম' 'শিরীঁ' তোমার নেশা টুট্‌বে না,
যদিই তামাম জাহান জু'টে শির্ 'পরে মোর তীর হানে ॥

জান কি সই, কেনই আমায় ফেরায় গ্রহ দিগ্বিদিক ?
তোমার পানে মন টানে মোর, ঈর্ষা জাগে ওর প্রাণে ॥

ব্যথিত্ আমি, বুকের আমার ব্যথার খবর দেয় গো ওই
তৃষার্ত্ত ঠোঁট সিক্ত আঁখি শুষ্ক মুখের উদ্যানে ॥

খুব্‌সুরত্ ঐ রূপের তারিফ লিখ্‌নু যেদিন, সেই হ'তে
আমার বইয়ের পাতার কাছে ফুলের পাতা হা'র মানে ॥

'মাশুক' আমার আসুক ফিরে সুস্থ দেহে জল্‌দি গো,
আস্‌বে হেসে কখন্ পাশে শিস্ দেবে সুখ সিন্তানে ॥

দোহাই খোদার ! কোথায় হাফিজ, যদিই গো কেউ জিজ্ঞাসে,
ব'লো—পথিক গেছে কেঁদে আমা হতে দূর পানে ॥

দিল্‌জানী = প্রিয়তমা ॥ বদ্-নসিব = ভাগ্যহত ॥ নজর = উপহার ॥ কসম্ = দিব্য ॥
তারিফ = প্রশংসা ॥ তামাম জাহান = সারা বিশ্ব ॥ মাশুক = প্রিয়া ॥

প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্প

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

সুদূর অতীত সভ্যতার যে সুন্দর পরিণত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে, তাহাকে শুধু আমরা অতীতের মধ্যেই সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করি। সে যেন প্রচুর কঙ্কর-বালুকার মধ্যে বিলীনপ্রায় স্রোতস্বিনী। ক্ষীণতম ধারাটি যেন আর চটুলা নর্ত্তকীর মতো আপনার গতিভঙ্গীকে মনোরম করিতে পারে নাই। নির্ঝরিণী বিশীর্ণা, উপলব্যথিতগতি; সংকীর্ণ প্রবাহ কিছুদূর আসিয়া যেন অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

তাই, সে সভ্যতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, আলোচনা নাই; পরবর্ত্তীকালের সাধনার গতি কোন্ মুখে যাইবে তাহার জন্য চিন্তা নাই, ধারণা নাই; আপনার সাধনার মধ্যেই সে সভ্যতার একটি প্রশান্ত সমাপ্তি খুঁজিয়া পাইয়াছে। যেন একটি বিরাটকায় কূর্ম্ম তাহার বাহিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আপনার কঠিন আবরণের মধ্যে সংযত, সংহত করিয়া নিশ্চল পাষাণখণ্ডের মতো পড়িয়া আছে।

অতীত সভ্যতার এই আপাত-অচল পরিণতির মধ্যে গতিবেগ যে ছিল না, এমন কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। গতি না হইলে পরিণতি কেমন করিয়া হইল? কাব্য-কবিতা ছিল, সঙ্গীত-নাটক ছিল, দর্শন-শিল্প ছিল,—এক কথায় পূর্ণতার আদর্শের অনুপাতে একটি বিরাট সভ্যতার যাহা থাকা প্রয়োজন, তাহা সবই ছিল।

গতিকে যখন পাইতেছি, তখন জীবন-প্রবাহের বহুমুখী বিভিন্ন বিচিত্র লীলাবেগকেও পাইব। কিন্তু সে প্রবাহলীলা যেন পাতালের অদৃশ্যা ভোগবতী। সন্ধান পাইতে হইলে শুষ্ক কঠিন মৃত্তিকাস্তর ভেদ করিতে হইবে। কত যুগ-যুগ সঞ্চিত সুকঠোর আবরণ;—কত বিপুল প্রয়াস, কত নিষ্ঠুর আঘাত তাহার উপর দিয়া গিয়াছে; কোথাও যেন খননের চিহ্নমাত্র নাই। সাধ্য থাকিলে নিজের রচিত সোপান-শ্রেণী বাহিয়া নামিয়া যাইতে হইবে। তারপরে সে প্রবাহ-লীলার দর্শন মিলিবে।—প্রাচীন মানুষের জীবন-প্রবাহের লীলা,—তাহার দর্শন-বিজ্ঞান শিল্প-কলার প্রাণ-স্রোত—বিশেষ করিয়া তাহার কাব্যনাট্য ও কথা-সাহিত্যের রসধারা!

কিন্তু সেখানেও সেই একই মানুষকে আমরা দেখিতে পাই—তাহার জীবন, তাহার প্রেম ও তাহার নিবিড় বেদনা-বোধের পরিচয়-ই পাই! তাই ত, আমরা আমাদের রসোপলব্ধির প্রেরণার মূলে সেই সত্যবোধকে আবেষ্টন করিয়া ধরি;—সকল মানুষের বিচিত্র জীবন-প্রবাহের মধ্যে পরমাত্মীয়ের মতো অভিন্নতার সমগ্র রূপটি আমাদের প্রাণে সহানুভূতির উদ্রেক করে। এইখানেই সত্যকারের সাহিত্যের রসানুভূতির জন্ম।

কাব্যপ্রকাশ-কার যাহাকে 'সামাজিক রসানুপ্রেরণা' বলিয়াছেন, আমরা সাধারণতঃ সে প্রেরণাকে নাটক ও অভিনয়ের মধ্যেই একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাই। এই নাটক ও নাট্যাভিনয়কে কেন্দ্র করিয়া নাট্যশিল্প গড়িয়া উঠে। প্রাচীন যুগেও তাহাই হইয়াছিল। কথা বা আখ্যান-আখ্যায়িকার মধ্যেও এই সামাজিক রসানুভবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। কিন্তু, নাট্যাভিনয়ের মধ্যে তাহাকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে পাই, আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের মধ্য দিয়া তাহার যে সরস সুন্দর রূপটি ফুটিয়া উঠে, এমনটি বোধ করি কোথাও হয় না। তাই চিরদিনই অভিনয়ে জনপ্রীতি এত বেশী এবং প্রাচীন যুগেও নাট্য-শিল্পের প্রসিদ্ধি ও পরিণতি এত বিচিত্র ও বহুমুখী।

কালের জড়তাস্তর ভেদ করিয়া যে প্রাচীন ভারত তাহার 'ধীরোদাত্ত প্রতাপবান্' নায়কচরিত্র ও শান্তরসাস্পদ তপোবনের সার্থক চিত্র লইয়া আমাদের মানসচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, কয়েকখানি কাব্য ও নাটকই তাহার আলম্বনভূমি। প্রাচীন সভ্যতা ইতিহাস রাখিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশীলনের একটি

শ্রদ্ধাশীল পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছিল। তাহারই ফলে আজ বেদ-সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য-নাটক প্রভৃতি ললিত-কলার সুক্ষ্ম বিস্তর পরিচয় আমরা পাইতেছি।

এই কাব্যনাটকগুলির রচনাকাল ও রচয়িতাদের লইয়া এখন নানা প্রকারের মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি আবার কবি অশ্বঘোষ ও কবি ভাসের নাটকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে একটি অভিনব শ্রেণীবিভাগ আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া আরও কতশত অজ্ঞাত অখ্যাতনামা কবি ও নাট্যকারের রচনা কালের বিপুল জঠরে লীন হইয়া আছে, সে সকলের ত কোনো সন্ধানই নাই।

আপাতত আমরা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নাটকগুলি লইয়া আলোচনা করিব না। তাহাদের উল্লেখ করিব মাত্র।

অশ্বঘোষের শারিপুত্রপ্রকরণ বা শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ; কবি ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, অবিমারক, পঞ্চরাত্র, দূতবাক্য, বালচরিত, উরুভঙ্গ, কর্ণভার, প্রতিমা-নাটক, অভিষেকনাটক প্রভৃতি; কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, অভিজ্ঞানশকুন্তল; কবি শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকা; চন্দ্র, শ্রীহর্ষ ও মহেন্দ্রবিক্রমবর্ম্মার নাটকগুলি; প্রসিদ্ধ কবি ভবভূতির মালতীমাধব, বীরচরিত, উত্তররাম-চরিত এবং বিশাখদত্ত, ভট্টনারায়ণ, মুরারী ও রাজশেখরের নাট্যগ্রন্থগুলি মহাকালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কত সুদূর শতাব্দীর সমাজ-জীবন, লোকচরিত্র, জীবন-বেদনা প্রভৃতির সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছে।

এখানে এই নাটকগুলির নামোল্লেখ করিলাম, কেন না এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে সুবিস্তৃত ও সুপরিণত নাট্য-সাহিত্য ও তাহার সূক্ষ্ম সমালোচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সংক্ষেপে তাহারই একটু পরিচয় দিব।

এইখানেই বোধ হয় প্রাচীনসাহিত্যের বিশেষত্ব। বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিবার এই যে ধারা, তাহার আলোচনা করিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। তাই যখন রসানুভূতির মতো সুকোমল মনোবৃত্তিকে লইয়া কাব্য-প্রকাশকারকে চিকিৎসাব্যবসায়ীর ন্যায় অস্ত্রপরিচালনা করিতে দেখি, তখন সত্যই আমাদের আহত হইয়া ফিরিতে হয়। তবু ভাবিয়া দেখিলে এইগুলির একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আজ যদি বিশ্বনাথ কবিরাজ, দণ্ডী, ভামহ, অভিনব গুপ্ত, কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট, নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকদের অভিমত আমরা জানিতে না পারিতাম কিংবা তাঁহাদের সমালোচনা-সাহিত্য অমন দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের একটি বিরাট অবয়ব ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া রহিত। পরমতাসহিষ্ণুতা, রচনার অসঙ্গতি দোষ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিচয় পাইলেও ইহাতে আমরা একটি বিশেষ বস্তুর পরিচয় পাই;— আলোচনা করিবার একটি ধীর সংযত রীতি,—আলোচ্য বস্তুটিকে লইয়া নানা নূতন নূতন দিক হইতে সত্য সমালোচনার কারুকার্য্য-রচনা;— এইগুলি সত্যই প্রণিধানযোগ্য।

নাট্যশিল্প লইয়া আলোচনা চলিয়াছে, দেখিতে পাই বিশেষ করিয়া ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। পাণিনি যেমন পরিবর্দ্ধিত ভাষার আয়তনকে শৃঙ্খল পরাইবার জন্য ব্যাকরণসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, মহামুনি ভরত তেমনি সুপরিণত নাট্যসাহিত্যকে নিয়মিত করিয়া দিবার জন্য এই নাট্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর আচার্য্য অভিনব গুপ্ত খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে 'ভরত নাট্যবেদবিবৃতি' নাম দিয়া ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের একটি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়া যান। নাট্যশাস্ত্রের কঠিনতাকে কিছু সরল করিয়া দিয়া যান ধনঞ্জয়, তাঁহার 'দশরূপক' নামক সমালোচন-গ্রন্থে।

পরে আমরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত তিনখানি বিখ্যাত গ্রন্থের দেখা পাই।

প্রথমত, বিদ্যানাথের 'প্রতাপরুদ্রীয়';—'দশরূপক' ও 'কাব্যপ্রকাশ'কে অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি রচিত।

দ্বিতীয় খানি বিদ্যাধর কৃত 'একাবলী'। গ্রন্থকার উড়িষ্যার রাজা দ্বিতীয় নরসিংহের (১২৮০-১৩১৪) পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় খানি বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য-দর্পণ।' এই গ্রন্থখানিতে আমরা প্রবীন নাট্যশিল্পের একটি বিস্তৃত পরিচয় পাই। সাহিত্য-দর্পণের ষষ্ঠ অধ্যায়টি ধনঞ্জয়ের দশরূপক ও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত। নাটকের বিশেষত্ব ও নাটকীয় অলঙ্কার-রীতির যথাযথ বিচার দশরূপককার করেন নাই। সাহিত্য-দর্পণকার 'দশরূপকের' সেই ত্রুটি সংশোধিত করিয়াছেন তাঁহার ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

অভিনব গুপ্ত আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার আলোচনা-বিচার করিতে গিয়া নাট্যাভিনয়ের নৈপুণ্যপ্রয়োগের অবতারণা করিয়াছেন। মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসেও রস-বিচারে সেই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কবিতার কাব্যাংশের সহিত নাটকের কাব্যাংশের বিশেষ পার্থক্য রাখিতেন না। মূল দৃষ্টি ছিল রস-বোধের উপর। কাজেই রসানুভূতির বিচারে কবিতা ও অভিনয়—উভয়ের কথাই আসিত। এইরূপে রসাত্মক কাব্যালঙ্কার সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের বিশদ আলোচনা হইত। এবং সেই জন্য নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে এত বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এই প্রাচীন নাট্যশিল্পের উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে; উৎপত্তির বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কথাই কিছু বলিব।

নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে পুরাতনী কথা আছে, তাহা এইরূপ।—

দেবতারা একদিন লোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া যাহাতে নয়নমনশ্রবণের পরিতৃপ্তি হয়, এমন কোনো নূতন ধরণের সাহিত্যসৃষ্টি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বেদ সর্ব্বজ্ঞান-শাস্ত্রাদির আকর। জনসাধারণ বেদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কোনো কিছুকে সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ—বলিয়া পূর্ব্বের বেদ-চতুষ্টয়কে শূদ্র ব্যতীত অপর শ্রেণীরা প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই একটি সাধারণীসংহিতার সৃষ্টি হইল। সেটি নাট্যবেদ।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন—

সংকল্প্য ভগবানেবং সর্ব্ববেদাননুস্মরণ্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্ব্বেদাঙ্গসম্ভবম্॥
—ভরত-নাট্যশাস্ত্র, ১ম অধ্যায়, ১৬

সকল বেদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই নাট্যবেদ রচিত হইল।

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ, সামেভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্ব্বেদাদভিনয়ান রসানথর্ব্বণাদপি॥
—ভরত-নাট্যশাস্ত্র, ১ অধ্যায়, ১৭

ঋগবেদ হইতে বাক্যাবলী ও আবৃত্তি-ভাগ গৃহীত। সামবেদ হইতে সংগীতাংশ লওয়া হইল। যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয়ের কলাকৌশল সংগ্রহ করা হইল। অথর্ব্ববেদ রস-পরিবেশন করিল।

তাহার পরে ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন।

ঋষি ভরতকে বলিলেন,—তুমি কর্ম্মকর্ত্তা বা কর্ম্মসচিব হইয়া নাট্যশিল্পের প্রবর্ত্তনা কর।

সেই হইতে মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া বিখ্যাত।

অভিনব গুপ্তাচার্য্য তাঁহার 'ভরত নাটবেদবিবৃতি' গ্রন্থে ভরতকেই নাট্যবেদের রচয়িতা বা প্রযোক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সহিত ভরতের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। যাঁহারা অভিনয় করিতেন তাঁহাদিগকে ভরত-পুত্র বা ভরত-শিষ্য বলা হইত। নাটক শেষ হইলে যে আশীর্ব্বচন গীত বা আবৃত্ত হইত তাহাকে ভরত-বাক্য বলা হইত। প্রচলিত নাটকগুলিতেও ভরতের উল্লেখ পাওয়া যায়;—'বিক্রমোর্ব্বশী'র তৃতীয় অঙ্কে ভরত-শিষ্যদের মধ্যে কথা চলিতেছে—

অপি গুরোঃ প্রযোগেণ দিব্যা পরিষদারাধিতা!'

'গুরুদেবের (ভরতের) অভিনয়-প্রয়োগনৈপুণ্যে স্বর্গের দর্শকসমাজ পরিতুষ্ট হইয়াছে ত ?'

'উত্তর চরিতের' চতুর্থ অঙ্কে লব ও জনকের কথোপথন-প্রসঙ্গে লবকে বলিতে শুনি।—

'তস্যৈব কোঽপ্যেকদেশঃ সন্দর্ভান্তরেণ
রসবানভিনেয়ার্থঃ কৃতঃ। তঞ্চ স্বহস্তলিখিতং
মুনির্ভগবান্ ব্যসৃজদ্ ভগবতো ভরতস্য মুনে-
স্তৌর্য্যত্রিকসূত্রকারস্য।'

মুনি বাল্মীকি সেই রচনার কোন এক অংশ করুণ রসপূর্ণ অভিনয়ের যোগ্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা তিনি নিজ হস্তে লিখিয়া নৃত্যগীতবাদিত্রশাস্ত্রের আচার্য্য ও প্রথম প্রবর্ত্তক ভরত মুনির নিকট পাঠাইয়াছেন।

ভট্টনারায়ণ কৃত বেণীসংহারের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই সহদেব ভীমসেনকে বলিতেছেন,

—"(সানুনয়ম্) আর্য্য, মর্ষয়, মর্ষয়। অনুমতমেব নো ভরতপুত্রন্যাম্য বচনম্। পশ্য—"

এখানে ভরত-পুত্র,'ভরত-শিষ্য বা নট—এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মহামুনি ভরতই নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ও প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত।

তারপর মুনি ভরত ব্রহ্মাকে বলিলেন, এখন এই নাট্যবেদ লইয়া আমি কি করিব ?

ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্রধ্বজপূজাকাল আগত; ঐ সময়ে তোমার নাট্যবেদের প্রয়োগ কর।—

অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রস্য প্রবর্ত্ততে।
অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্॥
—নাট্যশাস্ত্র ১।২১

'দেবাসুরের দ্বন্দ্ব ও দেবতাদের নিকট অসুরদের পরাজয়-কাহিনী, নাটকরূপে অভিনয় করা হইল। দেবতারা ত নিজেদের জয়গাথা শুনিয়া মহা খুশী। কিন্তু অসুরেরা দলে দলে আসিয়া অভিনয়ে বাধা দিতে লাগিল। মহেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ধ্বজ উদ্যত করিয়া অসুরদের আক্রমণ করিলেন। অসুররা জর্জ্জরীভূত হইল। তাই ইন্দ্রের ধ্বজার নাম হইল 'জর্জ্জর'।

এই ইন্দ্রধ্বজের সঙ্গে 'সংস্কৃত নাটকোৎপত্তির পৌরাণিক ইতিহাস বিজড়িত। ইন্দ্রধ্বজ বা জর্জ্জরপূজা প্রাচীন নাট্যমণ্ডপ-নির্ম্মাণের পর গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বের একটি প্রধান মঙ্গলানুষ্ঠান। নাট্যশাস্ত্রে এই জর্জ্জরপূজার মন্ত্র আছে।—

মহেন্দ্রস্য প্রহরণং ত্বং দানবনিসূদন॥১১॥

* * *

নমিতস্ত্বং সর্ব্বদেবৈঃ সর্ব্ববিঘ্ননিবর্হন।
নৃপস্য বিজয়ং শংস রিপুণাঞ্চ পরাজয়ম্॥১২॥
—ইত্যাদি

যে সকল পাশ্চত্য পণ্ডিত বলেন যে, পূর্ব্বে ভারতে নাট্যমণ্ডপ ছিল না, উন্মুক্ত প্রান্তরে অভিনয় হইত, তাঁহারা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সম্যক্ আলোচনা করিলেই তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিতেন।

নাট্যমণ্ডপই যদি না থাকিবে, তবে, অভিনয়ের পূর্ব্বে গৃহপ্রবেশ কি করিয়া হয় ?

এমন কি, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই আদেশ দেওয়া হইয়াছে —

'কুরু লক্ষণসম্পন্নং নাট্যবেশ্ম মহামতে।'
—নাট্যশাস্ত্র, ১।৪৫।

নাট্যগৃহ ও তাহার বিশদ আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল; এখন ইন্দ্রধ্বজের কথাই বলি।—

অনেকেই বলেন যে, ইন্দ্রধ্বজ বা জর্জ্জর পূজা হইতেই সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি; বিলাতে যেমন Maypole-এর উৎসব, তেমনি প্রাচীন ভারতের জর্জ্জর-পূজা।

বর্ষার মেঘাবরণকে প্রাচীনেরা বৃত্র বলিতেন। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেন। তাই বৃত্রহন্তা ইন্দ্র বর্ষাশেষে আকাশ নির্ম্মল ও মেঘাবরণ মুক্ত হইলে প্রাচীনদের নিকট হইতে পূজা পাইতেন। এই পূজার আয়োজনে তাঁহারা নৃত্য ও গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেন। ইন্দ্রের প্রতীকস্বরূপ ইন্দ্রধ্বজ প্রোথিত করিয়া পূজা চলিত। এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকলা ক্রমশ প্রসারলাভ করিয়াছিল। Macdonell তাঁহার History of Sanskrit Literature-এ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

নেপালে এই প্রাচীন প্রথা এখনও প্রচলিত আছে বলিয়া শুনা যায়।

নাটকে কি করিয়া নৃত্যের প্রচলন হইল, তাহার সম্বন্ধে পুরাতন কাহিনী এইরূপ।—

'অসুর বিজয়' অভিনয় দেখিয়া ত দেবতারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। নটরাজ মহাদেব কিন্তু ব্রহ্মাকে বলিলেন,—নাটকে নৃত্যের অভাব কেন?

ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিলেন—আপনি ত স্বয়ং নটরাজ! আপনি সে অভাবটি পূর্ণ করুন না কেন!

নটরাজ তখন তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করিলেন। তণ্ডু তাঁহার অনুচরের নাম। তণ্ডুকে বলিলেন—তুমি ভরতকে নৃত্যভঙ্গীগুলি দেখাও। তণ্ডু তখন ভরতকে সকলই দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। সেইজন্য তণ্ডুর নাম অনুসারে এই নৃত্যের নাম হইল তাণ্ডব।

এইবার গৌরীর আহ্বান আসিল। তিনি একটি উল্লাসহিল্লোলাকুল সুন্দর ও নবীন নৃত্যভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করিলেন। সে নৃত্যের নাম হইল লাস্য।

এইরূপে নৃত্যগীত ও অভিনয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য-সাধক কলানৈপুণ্যের সম্মিলনে নাট্যশিল্প একটি সম্পূর্ণ অবয়ব পাইল। পরে নাট্যশাস্ত্রকার ঋষি ভরত পৃথিবীতে নাট্যকলার প্রবর্ত্তন করিলেন।

দেবযাজী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

হৃদয়ের রণক্ষেত্রে শুনি আমি কঙ্কাল-গীতিকা—
শবের ক্রন্দন!
ভেঙে গেছে চন্দ্রলোকে কল্পনার পুষ্পিত বীথিকা,
আনন্দ-নন্দন!
বৈরাগী হয়েছে সুখ জয়ভঙ্গে আক্রান্ত চরণে
মর্ম্মাহত শ্রান্ত আশা মূর্চ্ছা গেছে;—আসন্ন মরণে
হাস্য মৌনব্রত,
উথলে অদৃষ্ট-সিন্ধু লালসার শোণিত বরণে,
আমি দৈব-হত!

কভু কি গেয়েছি গান জীবনের একটি প্রভাতে ?
লুপ্ত স্মৃতি তার !
হয় তো ফুটেছে ফুল বসন্তের উৎসব শোভাতে,
মনে নাহি আর !
হয় তো ঊষার বাঁশী শুনেছিল তরুণী ধরণী,
হয় তো আলোক-হ্রদে ভেসেছিল চাঁদের তরণী—
কোন্ জন্মান্তরে !
কৃষ্ণপক্ষ আজি বক্ষে, জাগে চক্ষে অদৃশ্য সরণি
অনন্ত প্রান্তরে !

প্রবৃত্তির মনে দ্বন্দ্ব ! ভাবে ভাবে তুমুল সংগ্রাম
চলে দিবা-যামী,
আত্মা করে আর্ত্তনাদ, অন্ধকারে ভাগ্য মোরে বাম—
পরাজিত আমি।
সে কার কবিত্ব-স্বপ্নে হ'ল বিশ্ব-প্রপঞ্চ রচনা,
বিরাট মস্তিষ্কে তার ব্যর্থতার জাগে কি শোচনা—
গোপন সন্দেহ ?
পূর্ণিমাতে অন্ধ রাহু গ্রাস করে প্রদীপ্ত জ্যোছনা,—
আকাশের স্নেহ !

কে তুমি গাহিছ গান, মানবতা ক'রে জপমালা,
কে তুমি বাতুল ?
যে ফুলে করিবে পূজা, চেয়ে দেখ নামাইয়া ডালা,
সে নহে রাতুল।
যুগ-যুগান্তর ধরি মর্ম্ম-সিন্ধু করিয়া মন্থন,
বিষভাণ্ড নিয়ে হস্তে করে শুধু গরল রন্ধন
দুর্ভগ মানব,

করিয়া অমৃত পান, দর্পে ভাঙে নিয়ম-বন্ধন
বিজয়ী দানব।

জ্বলন্ত কামের চিতা! প্রেম-কায়া ভস্ম-আভরণা—
স্তব্ধ ভাষা-বীণা!
নিষ্ঠুর ভুবন-মরু! করুণার করুণ ঝরণা
ক্ষীণ হতে ক্ষীণা।
দুশ্চর তপস্যা মাঝে লক্ষ যুগবাহী বর্ত্তমানে
কোথায় মধূথ সুধা? কে দেবতা নব-বার্ত্তা আনে?
স্বর্গ নহে ধরা!
তমিস্রা জয়শ্রী গাহে; কোথা তার পরিবর্ত্ত প্রাণে—
সুধা-ক্ষুধা-হারা?

তিমির-দুয়ারে আমি মানবক হানিতেছি কর
তাই অহরহ;
দ্বার খোলো, দ্বার খোলো—হে অনন্ত জ্যোতির নির্ঝর!
বিলম্ব দুঃসহ!
জাগাও দেবত্ব-ভ্রূণ সভ্যতার পঙ্কিল জঠরে!
সে আনন্দ-বেদনায় কী প্রেরণা কোমলে-কঠোরে
হৃদয়-গুহাতে!
প্রকাণ্ড আকাশ রেখে ক্ষুদ্র মোর আত্মার কোটরে,
ছড়াব দু'হাতে!

দেবতার পদধ্বনি শুনিব গো জগৎ-অন্তরে
আজো আছে আশা।
সে ধ্বনি আমারো বুকে বাজিবে গো না-শোনা মন্তরে—
অবাঙ্ময়ী ভাষা।

হৃদয়ের রণক্ষেত্রে মৃত যারা উঠিবে বাঁচিয়া,
ইন্দ্রিয়-সাগর মন্থি' সে অমৃত তুলিব সাঁচিয়া—
মরিবে দানব।
পূর্ণিমার শ্বেতপদ্মে ভূমানন্দে জাগিবে নাচিয়া
দেবতা মানব।

রাখো তব ধ্বজদণ্ড, ওগো চির-ধ্বংস-পড়ানিয়া!
রাত্রি হবে ভোর।
আবার উঠিবে সূর্য্য পরাণের রন্ধ্র-পথ দিয়া,
নব-জন্মে মোর।
আত্মার পুরশ্চরণে হবে-হবে চৈতন্য সাকার,
জ্যোতিষ্কের বন্যা-তোড়ে চূর্ণ হবে তিমির-প্রাকার,
—বিচিত্র দীপিকা!
মৃত্যুহীন স্বর্গ এসে শুনাইবে বসুধাকে তার
প্রণয়-লিপিকা!

রূপসী

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত

রেলে চাকুরী, কলম-পেশা-নহে—গার্ডের।

মনে পড়ে যৌবনের প্রারম্ভে ভাগ্য-দেবতার কাছে করজোড়ে বারম্বার এই চাকুরীটাই ভিক্ষা করিয়াছিলাম। সুকৃতির জোর ছিল, জুটিয়াও গেল। তখন কি ছাই মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়াছিলাম যে, ঘর ছাড়িয়া ভবঘুরের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানোতে যে আনন্দ আছে ভগবান তাহারও একটা সীমা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

তা দিউন, সে সীমা অতিক্রম করিয়া যে স্থানে পদার্পণ করিলাম, সে স্থানে দারুণ বিরক্তি ও নিরানন্দের ভাব থাকিলেও সেগুলা ক্রমে ক্রমে একদিন গা-সওয়া হইয়া আসিল। ভাবিলাম পনেরোটা বৎসর তো এমনি করিয়াই কোনদিন খাইয়া কোনদিন না খাইয়া কাটাইয়া দিয়াছি, বাকী দিনগুলাও না হয় তেমনি কাটিবে। তা বলিয়া যে জিনিষ একদিন স্বেচ্ছায় চাহিয়া লইয়াছি আজ তো তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না।

সারাদিনের দারুণ পরিশ্রমের পর 'ব্রেকভ্যানেই' সেদিন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। একে মালগাড়ী, তায় সকালের পূর্ব্বে কোথাও থামিবার প্রয়োজন নাই,—বুঝিয়া সুঝিয়া ঘুমটাও বোধ করি আসিয়াছিল নিবিড় হইয়া, এমন কতদিন আসে, পথের ঘুম শেষে পথেই ভাঙিয়া যায়—ক্ষতিবৃদ্ধি কাহারও হয় না।

ঘুমের মাত্রাটা বোধ করি তখন সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ পায়ের উপর কাহার স্পর্শ পাইয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। উপন্যাস-পড়া মন ধরিয়া লইল, নিশ্চয়ই উপকথার কোন রাজকন্যার দর্শন মিলিবে তা সে রাজকন্যা সুন্দরী তরুণী-ই হোক বা স্খলিতদন্তা প্রৌঢ়াই হোক! নিশ্চিত অনিশ্চিতের দোলায় দোল খাইতে খাইতে কোন প্রকারে হাত-বাতিটা জ্বালিলাম, আবার ডাক আসিল, বাবু!

সে কণ্ঠস্বর কোন তরুণী, এমন কি প্রৌঢ়ারও যে হইতে পারে না তাহা এক নিমেষেই বুঝিলাম, প্রশ্ন করিলাম, কে রে?

জবাব দিল, ইঞ্জিনের খালাসী, বাবু।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বলিল, মানে কোন একট ষ্টেশনে না-কি একখানা মালগাড়ী লাইন-চ্যুত হইয়া পড়িয়া আছে, সেটার কোন সদ্গতি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের এখানেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। হয় তো বা সকাল পর্য্যন্তই।

কোন নূতন সংবাদ নয়, বিশেষ হতাশ হইলাম না। বলিলাম, এটা কোন্ জায়গা জানিস?

লোকটা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানে। আরও বলিল, একটু সাবধানে থাকিবেন বাবু, জায়গা ভাল নয়।

বলিলাম, কেন বল্ তো?

বলিতে সে চায় না, বার বার শুধু সাবধানে থাকিবারই অনুরোধ করে। অনেক পীড়াপীড়ির ফলে শুনিলাম কে-এক ডুলন-কুলীর মেয়ে নাকি গত বৎসরে এইখানেই রেল লাইনের উপর তাহার কুলী-জীবনের পরিসমাপ্তি করিয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতেই শোনা যায় তাহারা প্রেতাত্মা নাকি গভীর রাতে এইখানে বসিয়া কাঁদে, রোজই।...

বাধা দিয়া বলিলাম, আচ্ছা, তুই যা!

কবে কোন্ কুলীর মেয়ে রেল-লাইনের উপর মাথা পাতিয়া মৃত্যু-বরণ করিয়াছে তাহার ইতিহাস শোনার মত উৎসাহ আমার তখন ছিল না। অমন কত কুলীর মেয়েকে রেলের তলায় চাপা পড়িয়া মরিতে স্বচক্ষেই তো দেখিয়াছি, দেখিয়া শুনিয়া রক্ত-মাংসে ঘেরা প্রাণটাও হইয়া গিয়াছিল ওই রেল-লাইনের মতই শক্ত কঠিন ...

সে চলিয়া গেল। কম্বলটা পিঠের উপর টানিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। শুইলাম বটে কিন্তু ঘুম আসে না। কোথাকার কে ডুলন কুলীর মেয়ে—এতবড় জীবনটায় যাহাকে কখনো দেখিলাম না, যাহার কথা ইতিপূর্ব্বে কোথাও কাহারও কাছে শুনিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না—তাহার কথাটাই আজ সবচেয়ে বেশী করিয়া মনে জাগিতে লাগিল। মনে হইল, হয় তো সে খু-উ-ব সুন্দরী, অমন সুন্দরী বোধ করি উচ্চবংশেও দুর্ল্ভ, হয় তো তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কত সর্দ্দার-কুলী পাগল হইয়া ডুলনের কাছে ছুটিয়া আসিত। ডুলনের কাছে আসিলে কি হইবে, মেয়েটা হয় তো গোপনে ভিন্ গাঁয়ের কোন নিঃস্বের পায়ে তাহার গোপন-পূজা উৎসর্গ করিয়াছিল। শেষে একদিন ডুলনের কানে সে পূজার সংবাদ গেল, লোকলজ্জার ভয়ে হয় তো—তাই বা কেন? জগতে ওসমানের অভাব তো নাই, হয় তো কোন ওসমান জগৎ সিংহের কোন ক্ষতি করিতে না পারিয়া শেষে আয়েষাকেই বাঁধিয়া রেল-লাইনের উপর তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

পড়া না-পড়া বিলাতী উপন্যাসের মত এমনি কত কল্পনাই মনে জাগিতে লাগিল। হঠাৎ দরজার কাছে কাহার পায়ের শব্দ হইল, চোখ তুলিয়া দেখিলাম, এক তরুণী, সুন্দরী ...

প্রচুর ভয় ও ভরসার ভিতর দিয়া প্রশ্ন করিলাম, কে?

তরুণী হাসি মুখে জবাব দিল, খুব ভয় পাইয়াছিস, নয়? আমি ডুলন-কুলীর মেয়ে রূপসী। কিন্তু তুই ভুল শুনিয়াছিস বাবু, আমি মরি নাই!

চোখের উপর আরব্যোপন্যাসের একটা অধ্যায় যেন নগ্ন মূর্ত্তিতে ঝরিয়া পড়িল। তাই তো...

বলিলাম, তবে যে লোকে বলে!

রূপসী হাসিল, যে হাসিতে মনের সন্দেহ টুটিয়া গিয়া অসীম লজ্জার সৃষ্টি করে, এ সেই হাসি! হাসিমুখেই সে বলিল, লোকে ভুল বলে, বাবু, মৃত্যু আমার হয় নাই, হয় তো—থাক, সে অনেক কথা।

রূপসী হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

বলিলাম, বলিতে আপত্তি আছে বুঝি?

কিছু না—বলিয়া সে দোরের কাছেই বসিয়া পড়িল, বাহিরের দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া যাহা বলিল, তাহার ভাব এই—

সে আজ আঠারো বৎসর আগের কথা, যেদিন শ্রাবণের অবিশ্রান্ত জল ও ঝড়ের মাঝখানে আমাকে প্রসব করিয়াই মা আমার পৃথিবীর সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব মিটাইয়া চলিয়া যান। বাপ ছিলেন রেলের কুলী, তা বলিয়া স্নেহ তাঁহার বুকে এতটুকু কম ছিল না, বরং কিছু বেশীই ছিল। বলুন তো বাবু, গরীব হলে কি ভালবাসিতে নাই! মায়ের মৃত্যুর পর বাবার সে স্নেহ যেন বাড়িয়াই চলিল। পাখী যেমন তার শিশুকে বুকের মাঝে আড়াল রাখিয়া স্নেহ যত্নে গড়িয়া তোলে বাবার বুকের মাঝে থাকিয়াই ক্রমে ক্রমে একদিন এই পৃথিবীকে চিনিলাম। পৃথিবীর আলো রূপ রস গন্ধ কিছুর সহিতই আমার পরিচিত হইতে বাকী রহিল না। ক্রমে একদিন বাল্য, বাল্য হইতে কৈশোরের রেখায় পা দিলাম। চোখে আকাশের রং বদলাইয়া গেল। মনের আনাচে-কানাচে একসঙ্গে কত রঙীন ফুল যে ফুটিয়া উঠিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কুলীর ঘরে জন্মাইলে কি হয় বাবু, কামনা সবাইকার বুকেই ভগবান অমর করিয়া পাঠাইয়াছেন।... তা ছাড়া রূপের দিক দিয়া এতটুকু বঞ্চিত করিলেও আমি হয় তো অনেক ভদ্রঘরের মেয়েদের চেয়েও সুন্দরী বলিয়া গণ্য হইতাম—সে বঞ্চনা রূপের-দেবতা করেন নাই, বে-হিসাবীর মত তাঁহার ভাণ্ডারের অনেকখানিই এই কুলীর ঘরে পাঠাইয়াছেন। সে যাক্,...

কৈশোরের পথে,—যেদিন সারা অঙ্গে রূপের জোয়ার ছোট-বড় অনেক ঢেউ তুলিয়া অকস্মাৎ বহিয়া গেল, সেদিন সে ঢেউ-এর মাঝে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে অনেককেই দেখিলাম। ছোটখাটোর কথা ছাড়িয়াই দিই, রেলের সাহেবও একদিন হঠাৎ বাবাকে ডাকিয়া মাহিনা বাড়াইয়া দিলেন ও অযাচিতভাবে কারণে-অকারণে এই কুলীর ঘরের একটা প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখা দিতে সুরু করিলেন। সাহেবের দৃষ্টি বড় ভাল ছিল না বাবু, সে দৃষ্টির মাঝে কি যে ছিল এবং কি যে ছিল না, সেদিন তাহা ভালরূপে বুঝিতে না পারিলেও আজ বেশ ভালই বুঝি!...

এই জায়গার আশেপাশেই সে বার বেশ রীতিমত ভাবেই বসন্ত দেখা দিল। প্রবল জ্বরের আক্রমণে কবে এবং কখন যে জ্ঞান হারাইয়াছিলাম জানি না। যেদিন চক্ষু মেলিলাম, দেখিলাম একখানি ব্যগ্রমুখ, দুইটি ব্যাকুল দৃষ্টি আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে! দুর্ব্বল চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাহাকে চিনিলাম! রেল-আফিসের দারোয়ানের ছেলে সে, নাম—জোয়ান সিং! জোয়ান আমার কপালের উপর তাহার হাতখানি রাখিয়া বলিল, খুব কষ্ট হইতেছে বুঝি? দুঃখ হয়, জান্ দিয়াও যদি তোর্ কষ্ট আরাম করিতে পারিতাম!

জোয়ানের সঙ্গে বাল্যের প্রথম দিন হইতেই পরিচিত। তাহাকে খেলার সঙ্গী করিয়া সমস্ত বাল্যটাই পার হইয়া আসিয়াছি, কৈশোরের ধাপে পৌছাইয়াই যেন আর তাহার সহিত তেমন করিয়া মিশিতে পারিতাম না। কী যে বাধা, কী যে সঙ্কোচ—যাক, সে কথা...

সারাটা দিন নিশ্চল পাথরের মত আমার পাশটিতে সে বসিয়া রহিল, সন্ধ্যার মুখে আমি নিজেই বলিলাম,—

এবার তুই যা জোয়ান্, তোর বাড়ীতে হয় তো—

বাধা দিয়া সে প্রশ্ন করিল, আমি থাকিলে তোর কষ্ট হয়,—বল্?

সেই আঁখি-তারকার ভিতর দিয়া সে কী গভীর ব্যথা ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছিল তাহা তোকে বলিতে পারিব না বাবু, মনে হইল মানুষ বুঝি এমনি করিয়াই মানুষকে পাগল করে!

মৃত্যু-দেবতার সহিত খুব এক চোট তুমুল যুদ্ধ সারিয়া লইয়া জোয়ান্ যে-দিন আমাকে সত্যসত্যই জীবনের পথে ফিরাইয়া আনিল, সে-দিন অন্তরের সত্যকার ভালবাসা তাহাকে না দিয়া থাকিতে পারি নাই। হয় তো তাহাকে ভালবাসিবার অধিকার আমার নাই, হয় তো তাহাকে ভালবাসা আমার পাপ—কিন্তু কি করিব বাবু, দুরন্ত মনের একগুঁয়ে কামনাটুকুর জন্য সে অনধিকার পাপকে বরণ করিয়া লওয়া ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন উপায়ই সে দিন ছিল না। মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম যে, ভালই হোক বা মন্দই হোক যাহাকে ভালবাসিয়াছি, ভালবাসার অধিকার আজীবন একমাত্র তাহাকেই দিব। তাহারই পায়ের তলায় যেন একদিন চোখ বুজিয়া দুনিয়ার দেনা-পাওনা মিটাইয়া যাইতে পারি, এ কামনা যেন আমার অটুট থাকে!

উপরকার দেবতার কানে সেদিন আমার এ প্রার্থনা গিয়া পৌঁছাইল কিনা জানি না, তবে তাহার কোন প্রত্যুত্তরই এ পর্য্যন্ত যে পাই নাই, তাহা একরূপ শপথ করিয়াই বলিতে পারি।

বেশ সারিয়া উঠিলাম, পোড়া দেহশ্রী যেন সুযোগ বুঝিয়া তাহার সৌন্দর্য্যের ডালি খুলিয়া বসিল। জোয়ান্ আসিত, বসিত—অথচ কী যেন বলিতে চাহিয়াও মূক হইয়া যাইত!

মিথ্যা বলিব না বাবু, ভাল কি আমিই তাহাকে বাসি নাই? তাহার জন্য আমি কি না করিতে পারিতাম? কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার মত যে স্পর্দ্ধা ভগবান কোন মেয়ের কণ্ঠেই দেন নাই, আমারও তাহা ছিল না। তাই নীরবেই অন্তরের ব্যথাটুকু অন্তরের ভিতর বাড়িয়াই চলিল।

সে একটা দিন, সেটা বোধ করি পূর্ণিমা-ই হইবে, সন্ধ্যার মুখে জোয়ান্ আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল, কি প্রয়োজনে কোথায় যাইতে হইবে,—কোন প্রশ্নই সে দিন আমার কণ্ঠে আইসে নাই, বড় বড় সাপগুলা বনের হরিণদের যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে বশ করিয়া ফেলে, ঠিক তেমনি মোহাবিষ্টের মত আমি তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম। বাড়ী হইতে পথ, পথ হইতে বন—শেষে বনের ভিতরকার ঝিলটার পাশে আসিয়া দু'জনেই দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মিথ্যা বলিব না বাবু, নিশিতে ডাকিলে লোকের মনে ভয় ভাবনার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত যেমন নিঃশেষে লোপ পায়, আমারও ঠিক তেমনি পাইয়াছিল।...

জোয়ান্ আমার হাত দুইটা হঠাৎ তাহার হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, এখানে কেন আসিয়াছি জানিস্? মিথ্যার খোলস খুলিয়া ফেলিয়া আজ সত্যটুকুই তোকে বলিতে চাই, তোকে আমি ভালবাসি রূপী, তোকে না পাইলে বোধ হয়—

বাকী কথা কয়টা বুঝি চোখের জলে আটকাইয়া গেল।

বুকের আরও কাছে আমাকে টানিয়া লইয়া সে আবার বলিল, তা বলিয়া তোর মনের এতটুকু স্বাধীনতার উপরেও আমি হাত দিব না। তোর অমত হইলে—

বাধা দিয়া বলিলাম, বিবাহ করিতে পারিবি?...

আমার গা ছুঁইয়া সে শপথ করিল—আজীবন আমাকেই সে তার কলিজার রাণী করিয়া রাখিবে।

ভরা জ্যোৎস্নার বুকে ঝিলের ধারে রাত্রির আকাশকে সাক্ষী করিয়া সেদিন আমাদের যে প্রাণ-বিনিময় হইল তা বোধ করি একমাত্র জাগ্রত দেবতাই দেখিলেন। বনের ফুলে আমাদের বাসর-মুহূর্ত্ত সৃষ্টি করিলাম, বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে সে উৎসবের শেষ ধ্বনিটুকুও মিলাইয়া গেল।

তাহার পর প্রত্যহই এই ঝিলের ধারে আমাদের দেখা হয়। কত দিন কত সন্ধ্যায় এই বনের ছায়ায় ছায়ায় আমরা হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়াছি, ঝিলের ধারে বসিয়া কত পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছি, কখনো কাছে কখনো বা দূরে আত্মগোপন করিয়া লুকোচুরী খেলিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বর্গ কখনো দেখি নাই বাবু, মনে হইত তাহার সৌন্দর্য্য বুঝি আমাদের কল্পলোকের সৌন্দর্য্যের কাছেও ম্লান হইয়া যায়! চওড়া বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া জোয়ান্ আমাকে কত গল্প বলিত, কত দেশ-দেশান্তরের— অবাক-বিস্ময়ে আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কখনো বা গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া ভাবিতাম বিশ্বের